শ্রী সুখময় ভট্টাচার্য শাস্ত্রী সপ্ততীর্থ

তন্ত্রপরিচয়

শ্রীসুধাময় ভট্টাচার্য শাস্ত্রীসপ্ততীর্থ

বিশ্ববাণী প্রকাশনী ॥ কলকাতা-৯

প্রকাশ ঃ চৈত্র ১৩৫৯
প্রথম (বি) সংস্করণ ঃ বৈশাখ ১৩৯১

প্রকাশক ঃ
রুদ্রকিশোর মণ্ডল
বিশ্ববাণী প্রকাশনী
৭৯/১বি, মহাত্মা গান্ধী রোড
কলকাতা-৯

মুদ্রক ঃ
নিউ বৈশাখী প্রেস
সুকুমার ঘোষ
৩৮, শিবনারায়ণ দাস লেন,
কলকাতা-৬

প্রচ্ছদ শিল্পী ঃ
বাবলু বর্মন

কুড়ি টাকা

যা দেবী পরমা শান্তিরারাধ্যা করুণা সতী।
অন্নদা দুঃখহা ধাত্রী তস্যৈ নিত্যং নমো নমঃ ॥

পরমারাধ্যা
শ্রীযুক্তা মাতৃদেবীর
শ্রীচরণে

নিবেদন

বেদাদি শাস্ত্র হইতে শ্রবণ, সম্ভাব্য বিরুদ্ধ মতবাদের খণ্ডন, শাস্ত্রানুকূল বিচারের দ্বারা প্রকৃত সিদ্ধান্তের দৃঢ়ীকরণ—এই ত্রিবিধ ঈক্ষণ (যথাক্রমে সমীক্ষা, পরীক্ষা ও অন্বীক্ষা) ব্যতীত নির্ভুল সিদ্ধান্তে পৌছানো যায় না। উপনিষদাদির ন্যায় তন্ত্র-শাস্ত্রেও এই ত্রিবিধ ঈক্ষণের সূত্রগুলি পাওয়া যায়। ইহাতে সমীক্ষার ভাগই অধিক। আচার্য অভিনবগুপ্ত ও ভাস্কর রায় তাঁহাদের দার্শনিক আলোচনায় এই ত্রিবিধ ঈক্ষণের তন্ত্র-বচন লইয়াই বিশদভাবে বিচার করিয়াছেন।

উপাসনার শেষ লক্ষ্য বা তত্ত্ব-সাক্ষাৎকারের কথা ভাষা দ্বারা প্রকাশ করা যায় না। সেই চরম অবস্থা শুধু অনুভববেদ্য, শ্রবন-মননাদির বাহিরে। শ্রুতি ও তন্ত্র-শাস্ত্রে এই বিষয়ে কোন মতভেদ নাই।

তন্ত্রশাস্ত্রও ভারত ভূমিতে শ্রুতির পাশাপাশিই চলিতেছে। হিমালয় হইতে গঙ্গা ও যমুনা—উভয়ই নিঃসৃত হইয়া দুই ধারায় যেরূপ আর্যাবর্তকে সরস ও পবিত্র করিয়াছে, বেদ ও তন্ত্র—ভারতীয় শাস্ত্রসমূহের এই দুইটি মূল উৎসও পরম পুরুষ হইতে (ভারতীয় পণ্ডিতগণের মতে) অবতীর্ণ হইয়া হিন্দু-সভ্যতার মর্মস্থলকে সরস ও উদ্ভাসিত করিয়াছে। প্রয়াগ-ক্ষেত্রে গঙ্গা-যমুনার মিলনের ন্যায় হিন্দু-সভ্যতার অন্যতম কীর্তি যোগদর্শন এবং বেদান্ত-দর্শনে বেদ ও তন্ত্রের সঙ্গম লক্ষ্য করিবার বিষয়।

আমাদের দেশের দর্শন-শাস্ত্র জিজ্ঞাসুর জিজ্ঞাসা চরিতার্থ করিবার নিমিত্ত মানুষের অনেক প্রয়োজনীয় কথারই আলোচনা করিয়াছে। লৌকিক ও অলৌকিক, আধিভৌতিক ও আধ্যাত্মিক, সকল রকমের আলোচনাই এইগুলিতে স্থান পাইয়াছে। ইহলোকের অনেক কিছু মানুষের প্রত্যক্ষগোচর হইলেও পরলোকের সব কিছুই অন্ধকারে। জিজ্ঞাসুর জিজ্ঞাসা ও জিজ্ঞাসা চরিতার্থ

করিবার উপায়, পথ বা গবেষণাকেই 'দর্শন' নাম দেওয়া যাইতে পারে। বেদ, বিশেষতঃ বেদের চরম ভাগ উপনিষদ্‌গুলিই আস্তিক দর্শনের মূল উৎস। অবশ্য ন্যায়-বৈশেষিকাদি যুক্তিমূলক দর্শন বেদের আনুগত্য স্বীকার করিয়াও স্বাতন্ত্র্যকে অনেকখানি প্রশ্রয় দিতে কুণ্ঠিত হয় নাই।

আত্মোপলব্ধি বা আত্ম-সাক্ষাৎকারের উপায়গুলি বলিয়া দিতে না পারিলে দর্শন-শাস্ত্র পূর্ণ মহিমায় প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। শুধু চিত্তশুদ্ধির উপায়রূপে কতকগুলি বিধিনিষেধ এবং নিত্য, নৈমিত্তিক ও কাম্য কতকগুলি অনুষ্ঠানের উপর জোর দিয়াও জৈমিনির পূর্বমীমাংসা-দর্শন দর্শনের মর্যাদা লাভ করিয়াছে সত্য, কিন্তু সর্বসাধারণকে আকর্ষণ করিবার অথবা সাধারণের জিজ্ঞাসা চরিতার্থ করিবার পক্ষে এই বিরাট দর্শনও পর্যাপ্ত নহে। আমাদের মনে হয়, কৌতূহলী জিজ্ঞাসুর নিকট সাংখ্য ও বেদান্ত দর্শনই সমধিক আপনার হইয়া উঠিয়াছে।

পাতঞ্জল, সাংখ্য, পূর্বমীমাংসা ও উত্তরমীমাংসা (বেদান্ত)—এই চারিটি দর্শনের অনেক সিদ্ধান্তের মূল অনুসন্ধান করিলে ব্রাহ্মণ, আরণ্যক এবং উপনিষদাদির শ্রুতির ন্যায় তন্ত্র-শাস্ত্রেও অনেক কিছুই পাওয়া যাইবে। সাধক, মুনি, ঋষি, ঋষিপত্নী ও ব্রহ্মচারীর জিজ্ঞাসা এবং অনুসন্ধিৎসা হইতেই গুরুপরম্পরায় বেদ ও তন্ত্রশাস্ত্রের বহু প্রক্রিয়া-প্রধান কর্ম-কাণ্ড এবং মনন-নিদিধ্যাসনের অনুকূল জ্ঞান-কাণ্ড বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে।

প্রাচীন আচার্যগণ বলিয়াছেন, তন্ত্রশাস্ত্র বেদের ন্যায়ই প্রমাণ এবং অভ্রান্ত সত্য। শাস্ত্রের কোন বচনে সন্দেহের অবকাশ নাই। ক্রিয়া-কাণ্ড যথাশাস্ত্র অনুষ্ঠিত হইলে ফল অবশ্যই ফলিবে। ফল না হইলে বুঝিতে হইবে, অনুষ্ঠানে ত্রুটি ঘটিয়াছে। অন্ধ ব্যক্তি সূর্যকে দেখিতে পায় না বলিয়া সূর্যের অস্তিত্বকে উড়াইয়া দেওয়া চলে না। যাঁহারা উপযুক্ত গুরুর চরণাশ্রিত হইয়া সেই পথে গিয়াছেন, তাঁহারাই লক্ষ্য বস্তুর সন্ধান পাইয়াছেন। সেই

পথের কোন নিন্দা তাঁহাদের মুখে শোনা যায় না। কোন কিছু গ্রহণ করিতে হইলে সর্বাগ্রে চিত্তকে শ্রদ্ধাপূত করিতে হয়—ইহাই আচার্যগণের উপদেশ। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় (৪।৩৪) শ্রীভগবান্ অর্জুনকে এই কথাই বলিয়াছেন—

তদ্ বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ॥

কর্ম ও ভক্তি—উভয়ের যোগ না থাকিলে মুক্তির অনুকূল তত্ত্বজ্ঞান উৎপন্ন হয় না। তন্ত্রশাস্ত্রের এই সিদ্ধান্ত। কর্ম ও ভক্তিই জ্ঞানের জনক-জননী। অধিকাংশ সাধন-শাস্ত্রেরই এই বিষয়ে সমান অভিমত। পূর্বমীমাংসার যাগ-যজ্ঞাদি অনুষ্ঠানের মত সকাম ও নিষ্কাম, নানাবিধ ইহলৌকিক ও পারলৌকিক কর্মের কথায় তন্ত্র-শাস্ত্র ভরপুর। জীবনের সকল ক্ষেত্রেই কর্মের আবশ্যকতা আছে। তন্ত্র-বিহিত কর্মের এইসকল ব্যবস্থাকে হিন্দু-সমাজ উপেক্ষা করিতে পারেন না। কর্ম-কাণ্ড ও জ্ঞান-কাণ্ডের সম্বন্ধ-বিচারে হিন্দুর কোন শাস্ত্রই উদাসীন নহে। এমন কি, জ্ঞানের ভাণ্ডার উপনিষদাদিতেও কর্ম-কাণ্ডের অনেক উপদেশ পাওয়া যায়। চিত্তশুদ্ধি ও তত্ত্বজিজ্ঞাসার উপায়রূপে সকল শাস্ত্রেই কর্মের একটা বড় স্থান আছে।

তন্ত্র-শাস্ত্রে কর্ম-কাণ্ড ও ভক্তি পরস্পর পরস্পরের পরিপূরক বলিয়া হরগৌরীত্ব লাভ করিয়াছে। এই হরগৌরী হইতেই জীবের সিদ্ধিদাতা গণেশের মত মোক্ষের প্রকাশ।

কর্ম ও জ্ঞানের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধের বিষয় ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত থাকায় কেহ কেহ কর্মের দিকে তেমন লক্ষ্য করিতে অনিচ্ছুক। পরন্তু এই কর্মকে অর্বাচীন মনে করিয়া যেন একটু অনুকম্পার দৃষ্টিতে দেখিয়া থাকেন।

স্বর্গত মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার মহাশয়ের মত কোন শক্তিশালী লেখক যদি তন্ত্র-শাস্ত্রের সমালোচনা

করিতেন, তবে তিনি কর্ম, ভক্তি ও জ্ঞানের সমন্বয়ের দিকেই পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেন বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। তাঁহার ফেলোশিপ্ বক্তৃতামালায় সমন্বয়ের দিকেই সমধিক দৃষ্টি।

দৈবী সম্পৎ লাভ করিতে হইলে, যে পথেই হউক না কেন, সাধনার প্রয়োজন। সাধনা করিতে গেলেই উপাস্যের সহিত একটা কিছু লৌকিক সম্বন্ধ স্থাপন করিতে না পারিলে উপাস্যকে একান্ত আপনার বলিয়া চিন্তা করিতে পারা যায় না। তাহাতে মনও প্রসন্ন হয় না। ইহাই ভক্তিবাদের মূল কথা।

শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর—এই পাঁচপ্রকার ভক্তি-মূলক উপাসনাই সাধন-মার্গে, বিশেষতঃ বৈষ্ণব শাস্ত্রে সমধিক প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। কেহ বা উপাস্যকে পিতৃরূপে, কেহ বা মাতৃরূপে, কেহ বা সখারূপে দেখিতেছেন। দাস্য ভাবে হনুমানের উপাসনার কথা রামায়ণ-পাঠকের অবিদিত নহে। মধুর ভাবের ভিতরে অনেক ভাবই নিহিত। উপাস্যের সহিত দাম্পত্য-সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া সাধনা করার কথাও তান্ত্রিক সমাজে সুবিদিত।

অন্যান্য ভাব অপেক্ষা মাতৃভাবের উপাসনাই তন্ত্রে সবিশেষ পুষ্টি লাভ করিয়াছে। জগতের মূল কারণকে মাতৃরূপে কল্পনা করিয়া সাধক আত্মনিবেদন করিয়া থাকেন। শাক্ত তান্ত্রিকের এই মাতৃসাধনা হিন্দুসংস্কৃতিতে একটি বড়-রকমের দান বলিয়া মনে করি। সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের মহাশক্তির মধ্যেই সাধক জগদম্বাকে প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন। খড়্গ ও সদ্যশ্ছিন্ন নরমুণ্ডের সহিত জননীর হাতের বর ও অভয়-মুদ্রা দেখিয়া সেই ভীমকান্ত মূর্তির প্রসাদস্নিগ্ধ জ্যোতিতে সাধক বিস্ময়াবিষ্ট হন। সন্তান এবং মার সম্পর্কের মত পবিত্র মধুর সম্পর্ক আর কিছু কল্পনা করা যায় না।

শাক্ত সাধকের ব্রহ্মময়ী আর ব্রহ্ম (পরম শিব) পারমার্থিক দৃষ্টিতে একই তত্ত্ব বা পদার্থ। তান্ত্রিক সাধক ব্রহ্মময়ী-জ্ঞানে কুমারীকেও পূজা করিয়া থাকেন। শুধু উপাসকই তাঁহার

পূজার সার্থকতা বুঝিতে পারেন। অন্যের দৃষ্টিতে ইহার সৌন্দর্য ও পবিত্রতা ধরা পড়িবার নহে। শাক্ত সাধক উচ্চ স্তরে আরোহণ করিলে পারিবারিক সকল সম্বন্ধের মধ্যেই ব্রহ্মময়ীকে প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন। ভক্তপ্রবর রামপ্রসাদ গাহিয়াছেন—

মা বিরাজে ঘরে ঘরে,
জননী তনয়া জায়া সহোদরা কি অপরে।

হিন্দু-সম্প্রদায়ের ভিতর যতরকম আনুষ্ঠানিক কর্ম-কাণ্ডের পদ্ধতি ও প্রচলন দেখা যায়, নিপুণভাবে লক্ষ্য করিলে প্রত্যেকটির ভিতরেই তন্ত্রের অল্প-বিস্তর প্রভাব ধরা পড়ে। কোন কোন সাম্প্রদায়িক উপাসনা-পদ্ধতিতে উগ্রভাবেই তন্ত্রের প্রভাব প্রকটিত হইয়া উঠিয়াছে। মীননাথ, গোর্খনাথ প্রমুখ সাধকদের সাধনাপদ্ধতি ও উপদেশাদি বিষয়ে বহু পণ্ডিত ব্যক্তি আলোচনা করিয়াছেন এবং করিতেছেন। লক্ষ্য করিলে দেখা যায়, সেইসকল সাধনা ও উপদেশের মধ্যে যোগ-দর্শনের অনেক ব্যাপার থাকিলেও তান্ত্রিক ভিত্তির উপরই সাধকদের সাধনা ও উপদেশ প্রতিষ্ঠিত। অধিকাংশ সাধকসম্প্রদায়ের সাধন সম্বন্ধেই এই সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে।

প্রসঙ্গতঃ তন্ত্র-শাস্ত্রের একটি মহান্ উপদেশের কথা স্মরণ রাখা ভাল। তন্ত্র-শাস্ত্র পুরুষ জীবকে শিবরূপে এবং নারী-মূর্তিকে গৌরীরূপে ভাবনা করিতে উপদেশ দেন—

যত্র জীবস্তত্র শিবো যত্র নারী তত্র গৌরী।

ভবানী শঙ্করকে বলিতেছেন—

ত্বদ্রূপাঃ পুরুষাঃ সর্বে মদ্রূপাঃ সকলাঃ স্ত্রিয়ঃ।

তন্ত্র-শাস্ত্র বলিতেছেন, মানুষ-জন্ম গ্রহণ না করিলে তত্ত্বজ্ঞান হইতে পারে না—

ন মানুষ্যং বিনান্যত্র তত্ত্বজ্ঞানন্তু লভ্যতে।

সাধনার দ্বারা মানুষই ক্রমশঃ দেবত্ব লাভ করে। নরদেহই জগদীশ্বরের শ্রেষ্ঠ মন্দির, এবং মানুষ-সৃষ্টিই তাঁহার লীলার চরম প্রকাশ। এই কথাটি মহাভারতেও (হংসগীতা, শা ২৯৯।২০) প্রকাশিত হইয়াছে—

গুহ্যং ব্রহ্ম তদিদং বো ব্রবীমি,
ন মানুষাচ্ছ্রেষ্ঠতরং হি কিঞ্চিৎ।

—গুহ্য একটী মহৎ তত্ত্ব বলিতেছি, মানুষ হইতে শ্রেষ্ঠ আর কিছুই নাই।

বৈষ্ণব কবি চণ্ডীদাসও বলিয়াছেন—

সবার উপরে মানুষ সত্য,
তাহার উপরে নাই।

এইসকল বচনের আকর হইতেছে—তন্ত্র-শাস্ত্র।

বঙ্গভাষায় যাঁহারা তন্ত্র-শাস্ত্রের আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে প্রথমেই স্বর্গত শক্তিসাধক পণ্ডিত শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব মহাশয় এবং পূর্ণানন্দবংশোদ্ভব স্বর্গত পণ্ডিত সতীশ চন্দ্র সিদ্ধান্তভূষণ মহাশয়ের নাম করিতে হয়। প্রস্তুত গ্রন্থে তাঁহাদেরই পদচিহ্ন অনুসৃত হইয়াছে। তাঁহাদের লেখা হইতেও বিশেষ সাহায্য পাইয়াছি।

তন্ত্রের নিবন্ধ গ্রন্থের মধ্যে আচার্য ভাস্কর রায়ের 'বরিবস্যা-রহস্যম্', বামকেশ্বরতন্ত্রের 'সেতুবন্ধ' টীকা এবং ললিতাসহস্রনামের ভাষ্য 'সৌভাগ্যভাস্করম্' ও আচার্য অভিনবগুপ্তের 'তন্ত্রালোকঃ' এবং 'তন্ত্রসারঃ' গ্রন্থ হইতে এই প্রবন্ধের অধিকাংশ সঙ্কলিত হইয়াছে।

আমার জন্মভূমি শ্রীহট্ট জিলায় অনেক প্রখ্যাত তান্ত্রিক অধ্যাপক ছিলেন। লিখিত গ্রন্থাদি প্রচারিত না হইলেও তাঁহাদের শিষ্যসম্প্রদায় কম ছিল না। অপ্রকাশিত সাধকও অনেকেই ছিলেন। প্রায় প্রত্যেক ব্রাহ্মণের ঘরে ব্যাকরণ, স্মৃতি, জ্যোতিষ

ও দশকর্মাদি ক্রিয়াকাণ্ডের পুঁথির সহিত দুই চারখানি আগম-শাস্ত্রের পুঁথিও দেখা যাইত। আসাম ও বঙ্গদেশের অনেক স্থানেই প্রসিদ্ধ বংশগুলিতে তান্ত্রিক পূজা অর্চার প্রতি সমধিক আকর্ষণ লক্ষ্য করিয়াছি। কামরূপে, পূর্ববঙ্গে, উত্তরবঙ্গে, দক্ষিণবঙ্গে এবং এই রাঢ়দেশেও একই রকমের তান্ত্রিক আচার দেখিতেছি। পশুভাবের আচার ও বীরভাবের আচার—এই উভয় ভাবের আচারই আসাম ও বঙ্গদেশে পাশাপাশি চলিতেছে। অন্যবিধ আচার খুবই কম।

দেশ বিভাগের ফলে গৃহহীন ও বৃত্তিহীন লক্ষ লক্ষ বাঙ্গালী হিন্দু তাঁহাদের পূর্বপুরুষের সাধনার মূল উৎসটিকে হয়তো কালক্রমে বিস্মৃত হইতে বাধ্য হইবেন—এরূপ আশঙ্কার কারণ ঘটিয়াছে। শৈশবাবধি পূর্বপুরুষগণের কিছু কিছু তান্ত্রিক অনুষ্ঠান দেখিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলাম। এই স্বল্পপরিসর গ্রন্থে যথাসম্ভব সরলভাবে তাহারই বহিরাবরণ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা হইল।

পরিশেষে এই গ্রন্থরচনার উৎসাহদাতা আমাদের বিভাগীয় অধ্যক্ষ শ্রদ্ধেয় ডাঃ শ্রীযুক্ত প্রবোধ চন্দ্র বাগচী মহাশয়ের নানাবিধ উপদেশের কথা স্মরণ করিয়া তাঁহাকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা নিবেদন করিতেছি। বিশ্বভারতীর অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নিত্যানন্দ বিনোদ গোস্বামী মহাশয়ের সাহায্যের কথাও এই প্রসঙ্গে কৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণ করি। ইতি

শ্রীসুখময় শর্ম্মা

রামনবমী, ১৩৫৯ সাল
বিশ্বভারতী, বিদ্যাভবন
শান্তিনিকেতন

সূচী

কর্ম-কাণ্ড

জ্ঞান-কাণ্ড

চিতিরূপেণ যা কৃৎস্নমেতদ্ ব্যাপ্য স্থিতা জগৎ।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ॥

তন্ত্র-শাস্ত্র সাধনবিদ্যা

তন্ত্রশাস্ত্র সাধনার শাস্ত্র। ইহা অতি গুহ্য বিদ্যা। গুরুর উপদেশ ব্যতীত এই শাস্ত্রের তত্ত্ব কেহই বুঝিতে পারেন না। ন্যায়, বৈশেষিক প্রভৃতি বিচার-শাস্ত্র লৌকিক বুদ্ধির গম্য, কিন্তু তন্ত্রশাস্ত্র সেরূপ নহে। গুরুর উপদেশ না পাইলে এই বিদ্যায় একেবারেই প্রবেশ করা যায় না। যদি-বা কোন তীক্ষ্ণধী ব্যক্তি শুধু শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াই শাস্ত্রার্থ বুঝিতে পারেন, তথাপি শাস্ত্রবিহিত সাধনাতে তাঁহার অধিকার আছে কিনা—ইহার বিচারক সিদ্ধ পুরুষ বা সদ্‌গুরু। তন্ত্রশাস্ত্রের উপদেশ—

গুরূপদেশতো জ্ঞেয়ং ন জ্ঞেয়ং শাস্ত্রকোটিভিঃ।

নদীয়া জিলার কুমারখালি গ্রামের সাধক স্বর্গত শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব মহাশয় তাঁহার তন্ত্রতত্ত্বের অবতারণায় বলিয়াছেন, 'মন্ত্রময় তন্ত্রশাস্ত্র মন্দিরের অভ্যন্তর ভিন্ন প্রাঙ্গণে বাজিবার যন্ত্র নহে, সিদ্ধ-সাধকের হৃদয় ব্যতীত সভায় সমাজে আলোচনার বস্তু নহে'। সাধক ব্যতীত আর কেহ তন্ত্রশাস্ত্র সম্বন্ধে উপদেশ দিবার অধিকারী নহেন। ভাবচূড়ামণি-তন্ত্রে বলা হইয়াছে—

তন্ত্রাণামতিগূঢ়ত্বাৎ তদ্ভাবোঽপ্যতিগোপিতঃ।

তন্ত্রশাস্ত্র অতি গুহ্য বিদ্যা। তাহার মর্মার্থও অতিশয় গুহ্য। আমাদের ন্যায় প্রাকৃত জনের আলোচনা শুধু বাহিরের বিষয়বস্তু সম্বন্ধে। সাধনার জ্যোতিতে পথ আলোকিত না হইলে তন্ত্রের মর্মস্থলে প্রবেশ করা যায় না। কুলার্ণবতন্ত্র বলিতেছেন—

ইয়ন্তু শাম্ভবী বিদ্যা গুপ্তা কুলবধূরিব।

শিবশক্তির কথোপকথন হইতে অবতারিত এই বিদ্যা কুলবধূর ন্যায় গোপনে রক্ষিত হইবে।

অনধিকারীর নিকট এই বিদ্যা প্রকাশ করিতে শাস্ত্র গুরুগণকে পুনঃ পুনঃ

নিষেধ করিয়াছেন। সাধক ব্যক্তি নিজের আচার ও উপাসনার ব্যাপার কোথাও প্রকাশ করিবেন না। আমাদের অধিকার এই বিষয়ে একান্তই নিম্নস্তরের। সুতরাং শাস্ত্রের তথ্য প্রকাশে আমরা অসমর্থ। শ্রদ্ধার সহিত আলোচনা করিতে বসিলে বাহিরের অনেক সৌন্দর্যও আমাদিগকে বিমোহিত করে।

একটি কথা গোড়াতেই স্মরণ করা প্রয়োজন। অধ্যয়নলব্ধ পাণ্ডিত্য আর সাধনা এক বস্তু নহে। বিশেষতঃ যশ এবং অর্থের লোভে যোগ-শাস্ত্র ও সাধন-শাস্ত্র বিষয়ে গবেষণা—ভারতীয় দৃষ্টিতে একপ্রকার ধৃষ্টতার মধ্যে গণ্য হইয়া থাকে। আমাদের এই আলোচনাকে সহৃদয় পাঠকগোষ্ঠী গবেষণারূপে গ্রহণ না করিলেই কৃতার্থ হইব। শুধু শিক্ষিত সমাজের কিঞ্চিত দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার নিমিত্তই আমাদের এই অনধিকারচর্চা।

শাস্ত্রের প্রামাণ্য

কোন শাস্ত্রেরই প্রামাণ্য বিষয়ে স্থির করিয়া কিছু বলিবার উপায় নাই। অনেক স্থলেই দেখি, গ্রন্থকার যেন আপন রুচি ও বিশ্বাস অনুসারেই সিদ্ধান্ত প্রচার করেন। 'ব্যাখ্যা বুদ্ধিবলাপেক্ষা'—(নৈষধীয়চরিত ১৭।৫০) মহাকবির এই বাক্যটি সকলপ্রকার ভাষ্য, বার্তিক, টীকা, টিপ্পনী ও সমালোচনার ক্ষেত্রে সমানভাবে প্রযোজ্য। তন্ত্রের প্রামাণ্য-বিচারেও এই নিয়মের ব্যতিক্রম হইতে পারে না।

তন্ত্রসাধক পণ্ডিতগণ তন্ত্রকে বেদের ন্যায়ই অপৌরুষেয় মনে করিয়া থাকেন। তাঁহাদের মতে তন্ত্রশাস্ত্র মানুষের রচনা নহে। স্বয়ং সদাশিব ও মহামায়া হইতে তন্ত্রের প্রকাশ। সকল সময়েই ভারতবর্ষে তন্ত্রের আদর ছিল, আছে এবং থাকিবে। সাধনপ্রণালীও একই ভাবে প্রবাহিত আছে। বিশেষত্ব এই যে, শুধু কলিযুগে তান্ত্রিক সাধনা বিশেষভাবে বিস্তার লাভ করিয়াছে। কারণ, কলিকালে তন্ত্রোপদিষ্ট পদ্ধতিতে সাধনা করিলে শীঘ্র শীঘ্র ফল লাভ করা

যায়। পুরাণাদি শাস্ত্রেরও এই উপদেশ। অথর্ববেদে তন্ত্রবিহিত অনেক অনুষ্ঠানের পদ্ধতি পাওয়া যায়।

ভাস্কর রায় প্রমুখ আচার্যগণের মতে তন্ত্রশাস্ত্রও শ্রুতির ন্যায়ই প্রমাণ। শৈব দার্শনিক শ্রীকণ্ঠাচার্য ব্রহ্মসূত্রের শিববিশিষ্টাদ্বৈত-ভাষ্যে তন্ত্রশাস্ত্রকে শ্রুতির সমকক্ষরূপে প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার মতে বেদ ও তন্ত্র উভয় শাস্ত্রই শিব হইতে প্রকাশিত।

শিববিশিষ্টাদ্বৈত-ভাষ্যের উপর অপ্পয় দীক্ষিত শিবার্কমণিদীপিকা-টীকা প্রণয়ন করিয়াছেন। এই টীকায় প্রসঙ্গক্রমে তন্ত্রের প্রামাণ্য বিচার করিতে যাইয়া গ্রন্থকার বলিয়াছেন—তন্ত্র দ্বিবিধ, বেদানুকূল ও বেদবিরুদ্ধ।

অনুমান হয়, বৌদ্ধ তন্ত্রগুলিকেই দীক্ষিত বেদবিরুদ্ধ বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। বরিবস্যারহস্যপ্রকাশে তন্ত্রকে ধর্মশাস্ত্রের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। পার্থক্য এই যে, মন্বাদি স্মৃতি কর্মকাণ্ডের পরিপূরক, আর তন্ত্রশাস্ত্র ব্রহ্মকাণ্ডের পরিপূরক।

অনেকের বিশ্বাস, বৌদ্ধগণই আদি তান্ত্রিক। তাঁহাদের দ্বারাই তন্ত্রশাস্ত্র প্রচারিত হইয়াছে। 'মহাযান' বৌদ্ধ-মত আর তন্ত্রশাস্ত্র একই বস্তু। তন্ত্রোক্ত দেবদেবী আর বৌদ্ধশাস্ত্রোক্ত দেবদেবীর অনেকাংশে মিল আছে। তন্ত্রশাস্ত্র খুব প্রাচীন নহে। এই শাস্ত্রের উৎপত্তি কৈলাসশিখরে, অর্থাৎ চীন, নেপাল, তিব্বত প্রভৃতি অঞ্চলে। মহর্ষি বশিষ্ঠও তান্ত্রিক উপাসনায় সিদ্ধ হইবার নিমিত্ত চীন দেশে গিয়াছিলেন, অন্যথা চীনাচার অবগত হইতে পারিতেন না। খুব বেশী প্রাচীন বলিতে গেলেও খৃষ্টীয় ষষ্ঠ বা সপ্তম শতকে ভারতবর্ষে এই প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধশাস্ত্র প্রসার লাভ করিয়াছে। তাহার পূর্বে কিছুতেই নহে। বৌদ্ধগণ অপেক্ষাকৃত অবিশুদ্ধ অর্বাচীন সংস্কৃত ভাষাতেই তন্ত্রগ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন।

অনেকে আবার হিন্দুধর্ম বা ব্রাহ্মণ্য ধর্মের সহিত বৌদ্ধ ধর্মের সঙ্করের ফলে এই শাস্ত্রের উৎপত্তি হইয়াছে—এইপ্রকার সিদ্ধান্ত করেন। বঙ্গদেশেই এই শাস্ত্রসঙ্কর ঘটিয়াছিল—ইহাও তাঁহাদের বিশ্বাস। কারণ বঙ্গদেশেই শাক্ত পীঠের বাহুল্য দৃষ্ট হয় এবং বঙ্গদেশেই এই শাস্ত্র সমধিক গৃহীত হইয়াছে। যদিও স্মৃতিনিবন্ধের প্রচারের ফলে তন্ত্রের অনেক বিধান লোপ পাইতে বসিয়াছে, তথাপি ক্রিয়াকাণ্ড, পূজাপার্বণাদির অনুষ্ঠানে তন্ত্রেরই প্রাধান্য

লক্ষিত হয়। অবস্থাপন্ন বাঙ্গালী ভদ্রলোকের বাড়িতে চণ্ডীমণ্ডপ না থাকিলে আভিজাত্যই ক্ষুণ্ণ হয়। এই চণ্ডীমণ্ডপই গ্রামের মিলনভূমি।

পরন্তু হিন্দু-শাস্ত্রের বিচার করিলে জানা যায়—তন্ত্র-শাস্ত্র শ্রুতিরই প্রকার-বিশেষ। তন্ত্রের অনেক দেবদেবীর উপাসনা বৌদ্ধধর্মেও প্রচলিত। এই কারণেই সম্ভবতঃ অনেকে তন্ত্রের মধ্যে বৌদ্ধগন্ধ প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন। পশুহিংসা-নিবারণরূপ বৌদ্ধধর্মের শ্রেষ্ঠ আচারটিকে বাদ দিয়া বৌদ্ধ মহাযান-সম্প্রদায়ের দেবদেবীর পূজা হিন্দুর তন্ত্রশাস্ত্রে অনুসৃত হইয়াছে—এইরূপ কল্পনার মূলে যুক্তি-সঙ্গত কোন প্রমাণ নাই।

তন্ত্রবিহিত পঞ্চ-মকারের যোগে উপাসনা অতি প্রাচীন। পাষণ্ডাচারের উল্লেখ করিতে যাইয়া শাক্যসিংহও নাকি মদ্যমাংসাদির উল্লেখ করিয়াছেন। বৌদ্ধ ধর্মের জন্মের পূর্বে যদি তান্ত্রিক সাধনা প্রচলিত না থাকিত, তবে শাক্য-সিংহ এরূপ বলিতে পারিতেন না। অনেক খ্যাতনামা পণ্ডিত ব্যক্তিও এই কথা বলিয়াছেন।[১]

মহর্ষি হারীত বলিয়াছেন—

'শ্রুতিশ্চ দ্বিবিধা প্রোক্তা বৈদিকী তান্ত্রিকীতি চ।' (মনুটীকা)

শ্রুতি দুইপ্রকার, বৈদিক ও তান্ত্রিক। কুল্লূক ভট্ট প্রমুখ মনীষীদেরও ইহাই অভিপ্রায়। ভগবান্ শঙ্করাচার্য তন্ত্র অনুসারেই সাধনার প্রকারভেদ প্রদর্শন করিয়াছেন। তিনি তাঁহার 'প্রপঞ্চসার'-নামক তন্ত্রনিবন্ধে তান্ত্রিক সাধনাকে ব্রহ্মজ্ঞানের পরম অনুকূলরূপে বিবৃত করিয়া গিয়াছেন। তদীয় প্রধান শিষ্য আচার্য পদ্মপাদ প্রপঞ্চসারের ভাষ্য রচনা করিয়াছেন। সর্বতন্ত্রস্বতন্ত্র মাধবা-চার্যও প্রপঞ্চসারকে আচার্য শঙ্করের রচিত বলিয়াই পরাশর-সংহিতার আচার-কাণ্ডের প্রথম শ্লোকের ভাষ্যে উল্লেখ করিয়াছেন। কেহ কেহ বলিয়া থাকেন, আচার্য শঙ্কর প্রপঞ্চসার-তন্ত্রের রচয়িতা নহেন। তাঁহাদের পক্ষে কোন যুক্তি-প্রমাণ পাওয়া যায় না।

তন্ত্রের প্রকাশ বা অবতারণা সম্বন্ধে 'শিবতত্ত্বরহস্য' গ্রন্থ হইতে জানা যায়,

১. 'তন্ত্রের প্রাচীনতা' প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য। প্রবাসী, ১৩৫৪, ফাল্গুন।

সদাশিবের পাঁচটি মুখ হইতে পাঁচপ্রকার তন্ত্রের উদ্ভব। পূর্ব মুখের নাম 'সদ্যোজাত'। এই মুখ হইতে প্রকাশিত তন্ত্রগুলি 'পূর্বাম্নায়' নামে খ্যাত। দক্ষিণ মুখের নাম 'অঘোর'। এই মুখ হইতে নিঃসৃত তন্ত্রগুলির নাম 'দক্ষিণাম্নায়'। পশ্চিম মুখের নাম 'তৎপুরুষ'। এই মুখ হইতে প্রকাশিত তন্ত্রসমূহের নাম 'পশ্চিমাম্নায়'। 'বামদেব' নামক উত্তর মুখ হইতে উদ্ভূত তন্ত্রগুলিকে 'উত্তরাম্নায়' বলে। ঊর্ধ্ব মুখের নাম 'ঈশান'। এই মুখ হইতে বিনির্গত তন্ত্রসমূহের নাম 'ঊর্ধ্বাম্নায়'।

তন্ত্রশাস্ত্র ঈশ্বরের আজ্ঞাস্বরূপ। এইহেতু তন্ত্রের প্রামাণ্য সম্বন্ধে কিছুমাত্র সন্দেহের অবকাশ নাই—তন্ত্রাচার্য ভাস্কর রায় বামকেশ্বরতন্ত্রের টীকায় এই অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন। তিনিই ললিতাসহস্রনামের ভাষ্যে বলিয়াছেন যে, তন্ত্রগুলি ব্রহ্মকাণ্ড, অর্থাৎ উপনিষদেরই শেষ বা অঙ্গস্বরূপ।

সদাশিব এবং পার্বতী অভিন্ন। পার্বতী জিজ্ঞাসু শিষ্যারূপে সদাশিবের শরণ লইয়াছেন, আর সদাশিব তন্ত্রের উপদেশে পার্বতীর সংশয় ভঞ্জন করিয়াছেন। কোন কোন স্থলে জিজ্ঞাসু মহাদেবকে পার্বতী উপদেশ দিয়াছেন। এই গুরুশিষ্য-ভাব লীলা ব্যতীত কিছুই নহে। স্বচ্ছন্দ-তন্ত্রে দেখিতে পাই—

গুরুশিষ্যপদে স্থিত্বা স্বয়মেব সদাশিবঃ।
প্রশ্নোত্তরপদৈর্বাক্যৈস্তন্ত্রং সমবতারয়ৎ॥

মেদিনী-কোষে দেখা যায়, তন্ত্র শব্দের অন্যতম অর্থ শ্রুতির শাখাবিশেষ। সাধারণতঃ তন্ত্রশব্দ শাস্ত্র-বাচক। বিশেষ অর্থে আগম-শাস্ত্র বা সাধন-শাস্ত্রকে বুঝায়। তন্ত্রশাস্ত্রের প্রাচীনতার অনুকূলে আরও একটি কথা বলিবার আছে। স্মৃতিসংহিতা এবং পুরাণাদিতে কোথাও স্পষ্টতঃ, কোথাও বা ভাবতঃ তন্ত্রশাস্ত্রের উল্লেখ আছে। কিন্তু কোনও তন্ত্রগ্রন্থে স্মৃতি বা পুরাণের নাম গৃহীত হয় নাই।

অনধিকারীর হাতে পড়িয়া শাক্ত ও শৈবতন্ত্রের কতকগুলি আচারের বিকৃতি ঘটিয়াছে। এই কারণে অনেকে তন্ত্রের সাধনাকে দুর্নীতিপূর্ণ বলিয়া মনে করেন। অনধিকারীর আচরণকেই তথাকথিত শিক্ষিত সমাজও তান্ত্রিক আচার বলিয়াই ভুল করেন। এই শাস্ত্রের উপরেও অনেকের এক-

প্রকার অশ্রদ্ধার ভাব আছে। কিন্তু শ্রদ্ধাবান্ জিজ্ঞাসুর দৃষ্টিতে তন্ত্র-শাস্ত্র বিশেষভাবে পূজার্হ এবং অভ্রান্ত সত্য। একদল লোক আছেন, যাঁহারা তন্ত্র বলিতে শুধু শাক্ত সম্প্রদায়ের উপাসনা-শাস্ত্রকেই বুঝিয়া থাকেন, কিছুতেই বৈষ্ণবাদির কথা মনে আনেন না। তাঁহারাও ভ্রান্ত। শাক্ত, বৈষ্ণব, শৈব, সৌর, গাণপত্য প্রমুখ সকল উপাসকই তন্ত্রানুসারে উপাসনা করিয়া থাকেন। গৌতমীয়-তন্ত্র, ক্রমদীপিকা, এবং শারদাতিলক – সাধারণতঃ এই তিনখানি তন্ত্র-গ্রন্থ অবলম্বনে বৈষ্ণবগণের দীক্ষা, উপাসনা প্রভৃতি কর্ম অনুষ্ঠিত হয়।

তন্ত্রশাস্ত্রের এক অংশে শান্তিক, পৌষ্টিক, মারণ, বশীকরণ, আকর্ষণ, উচ্চাটন প্রভৃতি কতকগুলি ক্রিয়ার পদ্ধতি বিবৃত হইয়াছে। এই ক্রিয়াগুলি একমাত্র ঐহিক ফললাভের উপায়স্বরূপ। ইহাতে চিত্তশুদ্ধি বা অপর কোন প্রকার পারত্রিক ফললাভের আশা নাই। শুধু অলৌকিক নানা কাণ্ড-কারখানা দেখাইয়া সম্মান ও অর্থ লাভের উদ্দেশ্যে একদল তথাকথিত তান্ত্রিক তন্ত্রশাস্ত্রের প্রতি আকৃষ্ট হন—ইহাও দেখা যায়। এই শ্রেণীর গেরুয়াধারী, জটাধর, সিন্দুর-তিলক, গঞ্জিকাসেবী, ত্রিশূলপাণি তান্ত্রিককে দেখিয়া অনেকে তন্ত্রশাস্ত্রকে পুঞ্জীভূত ভোজবাজীর আকর বলিয়া মনে করেন। পরন্তু যথার্থ তান্ত্রিক উপাসক এই জাতীয় সিদ্ধাই বা বুজ্‌রুকিকে উপাসনার বিঘ্ন বলিয়াই মনে করেন।

তন্ত্রশাস্ত্রের এইসকল সিদ্ধাই-প্রকরণ দেখিলে অনুমান হয়, সমাজের শক্তিহীনতার কোন অশুভ ক্ষণে মানুষের বুদ্ধি এই দিকেই সিদ্ধির পথ খুঁজিয়াছে। তপঃশক্তি ও দৈহিক শক্তি বিশেষভাবে হ্রাসপ্রাপ্ত না হইলে এই শ্রেণীর অভিচারাদি ক্রিয়ার কথা মনে পড়িবার নহে। এখনও দেখিতে পাই—দেব-দেবীতে যাঁহার বিশ্বাস নাই, যিনি এইসকল শাস্ত্রীয় আচার-অনুষ্ঠানের বিরোধী, তিনিও মানসিক অবসাদে, মকদ্দমায় প্রতিপক্ষকে জয় করিবার নিমিত্ত শান্তি-স্বস্ত্যয়ন করাইতেছেন, ৺বগলামুখীর মন্ত্রজপের নিমিত্ত ব্রাহ্মণকে বরণ করিতেছেন, গ্রহশান্তির উদ্দেশ্যে জ্যোতিষী পণ্ডিতকে কোষ্ঠী দেখাইতেছেন। এইসকল ব্যস্ততায় তাঁহার মনের দুর্বলতার অনুমান করা চলে। সমাজেও অবসাদের লক্ষণ দেখা না দিলে বিনা তপস্যায় এবং বিনা শক্তিতে কার্য সিদ্ধ করিবার বাসনা জাগিতে পারে না। সমাজে এই শ্রেণীর প্রতারকের আবির্ভাব সকল সময়েই ঘটিয়া থাকে। মেরুতন্ত্রে বলা হইয়াছে—

প্রতারণার্থং লোকানাং যাচিতং দেবনামতঃ।
দ্রব্যং কৃতং তদ্‌বেষেণ গলিতং তন্ত্র রাজসম্॥

* * *

অথবা মারণাদ্যর্থং গলিতং তন্ত্র তামসম্॥

হিন্দুধর্মে তন্ত্রের প্রভাব

'বার মাসে তের পার্বণ' এই প্রবাদ-বাক্যটি হিন্দুর ধর্মানুষ্ঠানের বিপুলতা প্রকাশ করিতেছে। স্ত্রী-আচার ব্যতীত অনুষ্ঠানগুলির মধ্যে যাহা কিছু করা হয়, তাহাতে বৈদিক পদ্ধতির সংস্রব অত্যন্ত কম। তান্ত্রিক ও পৌরাণিক পূজাপদ্ধতির প্রচলনই হিন্দুসমাজে সমধিক। নিত্য উপাসনার ক্ষেত্রেও ভারতবর্ষের সর্বত্র তন্ত্রেরই আদর বেশী। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যগণ বৈদিক পদ্ধতিতে উপনীত হইয়াও পরে তান্ত্রিক দীক্ষা গ্রহন করিয়া থাকেন। গায়ত্রীর উপাসনা অপেক্ষা তান্ত্রিক দীক্ষায় ইষ্টদেবতার উপাসনাতেই হিন্দুগন বেশী সময় দিয়া থাকেন। ভয়-ভীতিতে গায়ত্রীর শরণ না লইয়া ইষ্টমন্ত্রকেই বেশী স্মরণ করেন।

বিষ্ণুচক্রচ্ছিন্ন সতীদেহ একান্ন খণ্ডে বিভক্ত হইয়া বেলুচীস্থানের হিঙ্গুলা-ক্ষেত্র হইতে আসামের কামরূপ পর্যন্ত তান্ত্রিক পীঠস্থানে পরিণত হইয়াছে। একই দেবতা সমগ্র ভারতে পরিব্যাপ্ত হইয়া ভারতীয় হিন্দুর তান্ত্রিক উপাসনার প্রবৃত্তি জাগাইতেছেন।

বৈদিক সাধনার শেষ লক্ষ্য এবং তান্ত্রিক সাধনার শেষ লক্ষ্য একই। মুক্তিই উভয় মতে চরম উপেয়। রুদ্রযামলে বলা হইয়াছে—

যদ্ বৈদৈর্গম্যতে স্থানং তৎ তন্ত্রৈরপি গম্যতে।

পথ বিভিন্ন হইলেও উভয়েরই গন্তব্য স্থল অভিন্ন। কলিকালে মানব স্বল্পায়ু এবং ভোগপ্রবণ। এইহেতু কলিকালে তান্ত্রিক অনুষ্ঠানই প্রশস্ত। কারন, তান্ত্রিক উপাসনায় শীঘ্র শীঘ্র ফল পাওয়া যায় বলিয়া শাস্ত্রে উপদিষ্ট হইয়াছে—

কলৌ তন্ত্রোদিতা মন্ত্রাঃ সিদ্ধাস্তূর্ণফলপ্রদাঃ। (মহানির্বাণ-তন্ত্র)

অনেকে মনে করেন, তান্ত্রিক উপাসনা বঙ্গদেশেই প্রথম প্রচলিত হইয়াছিল। পরে মিথিলায় প্রকটিত হইয়াছে এবং কালক্রমে মহারাষ্ট্রের কোন কোন স্থানে প্রচারিত হইয়া গুজরাটে বিলয় প্রাপ্ত হইয়াছে। এই বিষয়ে একটি প্রাচীন বচনও শোনা যায়—

গৌড়ে প্রকাশিতা বিদ্যা মৈথিলে প্রকটীকৃতা।
কচিৎ কচিন্মহারাষ্ট্রে গুর্জরে প্রলয়ং গতা॥

ভক্তিশাস্ত্র সম্বন্ধেও ঠিক এইপ্রকার বচন শোনা যায়। এই প্রবাদ-বাক্যটির বিশেষ মূল্য আছে বলিয়া মনে হয় না। কারণ ভারতের সর্বত্রই তান্ত্রিক উপাসনার সমান সমাদর দেখিতে পাওয়া যায়। সম্ভবতঃ জৈন-প্রভাবের ফলে ভক্তিশাস্ত্র ও তন্ত্রশাস্ত্র গুজরাটে প্রসার লাভ করে নাই—এবং এই কারণেই গুজরাটের উপর এইসকল শাস্ত্রজ্ঞদের কিঞ্চিৎ বিরক্তির ভাব এই প্রবাদে প্রকাশ পাইতেছে। দাক্ষিণাত্যেও কৌল সাধক অনেক প্রখ্যাত ব্যক্তির আবির্ভাব হইয়াছে। বঙ্গদেশ ও কাশ্মীরে হয়তো এই বিদ্যার সমাদর একটু বেশী হইয়াছিল। বিশেষতঃ বঙ্গদেশে তান্ত্রিক গ্রন্থাদিও কিছু বেশী পাওয়া যায়। তন্ত্র-গ্রন্থ অনেকগুলি লুপ্ত এবং অমুদ্রিত থাকিলেও সারা ভারতেই এই শাস্ত্র এবং শাস্ত্রোপদিষ্ট উপাসনা-পদ্ধতি আদৃত হইতেছে। বৈদিক আচার অপেক্ষা বঙ্গদেশে চিরকালই তান্ত্রিক আচারের প্রাধান্য। বাঙ্গালার প্রসিদ্ধ বংশগুলি এখনও তান্ত্রিক কোন সিদ্ধপুরুষ বা আচার্যকেই পূর্বপুরুষ-রূপে পরিচয় দিয়া কৃতার্থতা বোধ করে। কুলবধূ তান্ত্রিক দীক্ষা গ্রহণ না করা পর্যন্ত পরিবারস্থ গুরুজন সেই বধূর পক্বান্ন গ্রহণ করেন না এবং দেবগৃহের কোনও কাজে সেই বধূ সহায়তা করিতে পারেন না—এরূপ উদাহরণ কামরূপ হইতে রাঢ়দেশ পর্যন্ত বহু সম্ভ্রান্ত পরিবারে দেখিতে পাওয়া যায়। পারিবারিক ধর্মকৃত্যে এবং উপাসনাদিতে অধিকার লাভের নিমিত্ত গুরু হইতে তান্ত্রিক দীক্ষা গ্রহণ করা অবশ্য-কর্তব্য বলিয়া তন্ত্রশাস্ত্রের আদেশ। আস্তিক-সম্প্রদায় এই আদেশকে মান্য করিয়া থাকেন। এইভাবে যে ধারাটি এখনও প্রবাহিত, তাহাকে অস্বীকার বা অবজ্ঞা করিবার অবকাশ কোথায়।

তান্ত্রিক ক্রিয়াকাণ্ডের ফল প্রত্যক্ষসিদ্ধ বলিয়া উপাসকগণ মনে-প্রাণে বিশ্বাস করেন। তাঁহারা বলিয়া থাকেন—চিকিৎসাশাস্ত্র, জ্যোতিষ এবং তন্ত্রের বচন প্রতি পদে প্রত্যক্ষ সত্য—

চিকিৎসিত-জ্যোতিষ-তন্ত্রবাদাঃ,
পদে পদে প্রত্যয়মাবহন্তি।

বৌদ্ধ তন্ত্রকে বাদ দিয়া শুধু হিন্দু তন্ত্র সম্বন্ধেই আমাদের এই আলোচনা। হিন্দু তন্ত্রের মধ্যেও শাক্ত, শৈব, বৈষ্ণব ইত্যাদি বিভাগ আছে। সংখ্যায় শাক্ত তন্ত্রই বেশী পাওয়া যায়। তন্ত্রসমূহের মধ্যে পরস্পর দ্বেষপূর্ণ উক্তি থাকিলেও তাহার তাৎপর্য অন্যপ্রকার। অর্থাৎ স্ব-সম্প্রদায়ের আচারে সবিশেষ শ্রদ্ধা আকর্ষণই সেইসকল অশ্রদ্ধামূলক উক্তির তাৎপর্য।

শবরস্বামী বলিয়াছেন—

ন হি নিন্দা নিন্দ্যং নিন্দিতুং প্রযুজ্যতে।
কিং তর্হি। নিন্দিতাদিতরৎ প্রশংসিতুম্।
তত্র ন নিন্দিতস্য প্রতিষেধো গম্যতে।
কিং তু ইতরস্য বিধিঃ।

নিন্দ্য বিষয়কে নিন্দা করিবার নিমিত্ত নিন্দার প্রয়োগ করা হয় না, পরন্তু নিন্দিতাতিরিক্ত বিষয়কে অর্থাৎ বিধেয়কে প্রশংসা করিবার নিমিত্তই নিন্দার প্রয়োগ।

আগম, নিগম প্রভৃতি সংজ্ঞা

তন্ত্রের সমানার্থক আরও কয়েকটি শব্দের প্রয়োগ পাওয়া যায়। সেই শব্দগুলিও তন্ত্রশাস্ত্র অর্থেই প্রযুক্ত হইয়া থাকে। আগম, নিগম, রহস্য, সংহিতা, যামল, মন্ত্র এবং অর্ণব শব্দ তন্ত্রশাস্ত্র-বাচক।

কোন কোন গ্রন্থে আগম ও নিগম শব্দের ব্যুৎপত্তিলভ্য অর্থের পার্থক্য প্রদর্শিত হইয়াছে। যথা—

আগতং শিববক্ত্রেভ্যো গতঞ্চ গিরিজাশ্রুতৌ।
মতং শ্রীবাসুদেবস্য তস্মাদাগম উচ্যতে ॥

আগমের বক্তা শিব, শ্রোত্রী গিরিজা এবং সমর্থক বাসুদেব।

নির্গতং গিরিজাবক্ত্রাদ্ গতঞ্চ গিরিশশ্রুতৌ।
মতঞ্চ বাসুদেবস্য নিগমঃ পরিকথ্যতে ॥

নিগমের বক্ত্রী গিরিজা, শ্রোতা গিরিশ এবং সমর্থক বাসুদেব। হরপার্বতী-সংবাদ-রূপেই তন্ত্রশাস্ত্রের অবতারণা—এই কথা ইতঃপূর্বে বলা হইয়াছে।

তান্ত্রিক গ্রন্থকারদের কেহ কেহ বলিয়া থাকেন, দক্ষিণাচারের সাধন-শাস্ত্রের নাম আগম এবং বামাচার-সম্প্রদায়ের সাধনশাস্ত্রের নাম নিগম। কাশীবাসী শ্রীহট্টের প্রসিদ্ধ শিক্ষাব্রতী তান্ত্রিক ভারতচন্দ্র চৌধুরী বিদ্যাবারিধি মহাশয়ের মুখে শুনিয়াছি—কাশীতে কোনও সাধকের ঘরে নাকি অতি ক্ষুদ্র হস্তাক্ষরে লিখিত পাঁচখানি নিগম-গ্রন্থ অতিশয় গুপ্তভাবে আছে। গ্রন্থগুলি গুরুপরম্পরায় জ্ঞেয় অতি গুহ্য বিদ্যার আমর। নিগমকল্পলতা এবং নিগমকল্পতরু নামে দুইখানা প্রসিদ্ধ নিগম-গ্রন্থ তান্ত্রিক অধ্যাপকগণের বিশেষ আদরের।

গ্রন্থ, আচার্য ও সাধক

তন্ত্রশাস্ত্রের গ্রন্থসংখ্যা কম নহে। এই বিরাট সাহিত্যের অনেকাংশই লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। প্রসিদ্ধ একশত বিরানব্বইখানা তন্ত্রগ্রন্থের নাম জানা যায়। সাধকগণের ঘরে কোন কোন অপ্রকাশিত গ্রন্থ বিশেষ গোপনে গৃহদেবতার একাসনে স্থান পাইয়া পুষ্প-চন্দনচর্চিত হইলেও সেইগুলি লোকলোচনের অগোচরেই রহিয়া গিয়াছে। কালক্রমে হয়তো কোন পুণ্যসলিলার গর্ভে বিসর্জিত হইবে।

তান্ত্রিক পরিভাষায় ভারতবর্ষকে তিনভাগে বিভাগ করা হয়—বিষ্ণুক্রান্তা, রথক্রান্তা ও অশ্বক্রান্তা। অশ্বক্রান্তার অপর সংজ্ঞা গজক্রান্তা। মৃত্তিকা-স্নানের

বেলা হিন্দুগণ যে মন্ত্র পাঠ করেন, তাহাতে বিষ্ণুক্রান্তাদি তিনটি শব্দই বসুন্ধরার বিশেষণ-রূপে কথিত হইয়া থাকে। যথা—

অশ্বক্রান্তে রথক্রান্তে বিষ্ণুক্রান্তে বসুন্ধরে।
মৃত্তিকে হর মে পাপং যন্ময়া দুষ্কৃতং কৃতম্ ॥

শক্তিমঙ্গল-তন্ত্রে বলা হইয়াছে—বিন্ধ্যাচল হইতে চট্টগ্রাম পর্যন্ত ভূভাগের নাম বিষ্ণুক্রান্তা। বিন্ধ্য হইতে কন্যাকুমারিকা পর্যন্ত দক্ষিণ দেশের নাম অশ্বক্রান্তা। বিন্ধ্য হইতে চীনদেশ পর্যন্ত উত্তরাঞ্চলের নাম রথক্রান্তা। মহাসিদ্ধান্তসার-তন্ত্রের মতে করতোয়া হইতে যাভাদ্বীপ পর্যন্ত ভূভাগের নাম অশ্বক্রান্তা। এই তিনশ্রেণীর প্রত্যেক শ্রেণীতে তন্ত্রের সংখ্যা চৌষট্টি। সুতরাং তিন শ্রেণীতে তন্ত্রগ্রন্থের মোট সংখ্যা একশত বিরানব্বই।[১]

বিষ্ণুক্রান্তা শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত গ্রন্থ—সিদ্ধীশ্বর, কালীতন্ত্র, কুলার্ণব, জ্ঞানার্ণব, নীলতন্ত্র, ফেৎকারিণী, দেব্যাগম, উত্তর, শ্রীক্রম, সিদ্ধযামল, মৎস্যসূক্ত, সিদ্ধসার, সিদ্ধিসারস্বত, বারাহী, যোগিনী, গণেশবিমর্ষণী, নিত্যাতন্ত্র, শিবাগম, চামুণ্ডা, মুণ্ডমালা, হংসমহেশ্বর, নিরুত্তর, কুলপ্রকাশক, দেবীকল্প, গান্ধর্ব, ক্রিয়াসার, নিবন্ধ, স্বতন্ত্র, সম্মোহন, তন্ত্ররাজ, ললিতা, রাধা, মালিনী, রুদ্রযামল, বৃহৎশ্রীক্রম, গবাক্ষ, সুকুমুদিনী, বিশুদ্ধেশ্বর, মালিনীবিজয়, সময়াচার, ভৈরবী, যোগিনীহৃদয়, ভৈরব, সনৎকুমার, যোনি, তন্ত্রান্তর, নবরত্নেশ্বর, কুলচূড়ামণি, ভাবচূড়ামণি, দেবপ্রকাশ, কামাখ্যা, কামধেনু, কুমারী, ভূতডামর, যামল, ব্রহ্মযামল, বিশ্বসার, মহাকাল, কুলোড্ডীশ, কুলামৃত, কুব্জিকা, যন্ত্রচিন্তামণি, কালীবিলাস ও মায়াতন্ত্র।

রথক্রান্তা তন্ত্রশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত—চিন্ময়তন্ত্র, মৎস্যসূক্ত, মহিষমর্দিনী, মাতৃকোদয়, হংসমহেশ্বর, মেরু, মহানীল, মহানির্বাণ, ভূতডামর, দেবডামর, বীজচিন্তামণি, একজাতা, বাসুদেব-রহস্য, বৃহদ্গৌতমীয়, বর্ণোদ্ধৃতি, ছায়ানীল, বৃহদ্যোনি, ব্রহ্মজ্ঞান, গরুড়, বর্ণবিলাস, বালাবিলাস, পুরশ্চরণচন্দ্রিকা, পুরশ্চরণ-রসোল্লাস, পঞ্চদশী, পিচ্ছিলা, প্রপঞ্চসার, পরমেশ্বর, নবরত্নেশ্বর, নারদীয়, নাগার্জুন, যোগসার, দক্ষিণামূর্তি, যোগস্বরোদয়, যক্ষিণীতন্ত্র, স্বরোদয়, জ্ঞানভৈরব, আকাশভৈরব, রাজরাজেশ্বরী, রেবতী, সারস, ইন্দ্রজাল, কৃকলাসদীপিকা,

১. দ্রষ্টব্য—বসুমতী-প্রকাশিত প্রাণতোষণী গ্রন্থের ভূমিকা।

কঙ্কালমালিনী, কালোত্তম, যক্ষডামর, সরস্বতী, সারদা, শক্তিসঙ্গম, শক্তিকাগম-সর্বস্ব, সম্মোহিনী, আচারসার, চীনাচার, সদাম্নায়, করালভৈরব, শোধ, মহালক্ষ্মী, কৈবল্য, কুলসদ্ভাব, সিদ্ধিতাধারী, কৃতিসার, কালভৈরব, উড্ডামরেশ্বর, মহাকাল ও ভূতভৈরব।

অশ্বক্রান্তা তন্ত্রশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত—ভূতশুদ্ধি, গুপ্তদীক্ষা, বৃহৎসার, তত্ত্বসার, বর্ণসার, ক্রিয়াসার, গুপ্ততন্ত্র, গুপ্তসার, বৃহত্তোড়ল, বৃহন্নির্বাণ, বৃহৎকঙ্কালিনী, সিদ্ধতন্ত্র, কলাতন্ত্র, শিবতন্ত্র, সারাৎসার, গৌরীতন্ত্র, যোগতন্ত্র, ধর্মকতন্ত্র, তত্ত্বচিন্তামণি, বিন্দুতন্ত্র, মহাযোগিনী, বৃহদযোগিনী, শিবার্চনা, শবর, শূলিনী, মহামালিনী, মোক্ষ, বৃহন্মালিনী, মহামোক্ষ, বৃহন্মোক্ষ, গোপীতন্ত্র, ভূতলিপি, কামিনী, মোহিনী, মোহন, সমীরণ, কামকেশব, মহাবীর, চূড়ামণি, গুর্বার্চনী, গোপীয়, তীক্ষ্ণ, মঙ্গলা, কামরত্ন, গোপীলীলামৃত, ব্রহ্মানন্দ, চীন, মহানিরুত্তর, ভূতেশ্বর, গায়ত্রী, বিশুদ্ধেশ্বর, যোগার্ণব, ভেরণ্ডা, মন্ত্রচিন্তামণি, যন্ত্রচূড়ামণি, বিদ্যুল্লতা, ভুবনেশ্বরী, লীলাবতী, বৃহৎচীনা, কুরঙ্গ, জয়রাধামাধব, উজ্জশাক, ধূমাবতী ও শিবতন্ত্র।

বামকেশ্বর-তন্ত্রের প্রথম পটলে কৌলাচারের চৌষট্টিখানি প্রধান গ্রন্থের নাম গৃহীত হইয়াছে। যথা—মহামায়া, শম্বর, যোগিনী, জালশম্বর, তত্ত্বশম্বর, ভৈরবাষ্টক, বহুরূপাষ্টক (ব্রাহ্ম্যাদি অষ্ট মাতৃকার উপাসনাবিষয়ক আটখানা তন্ত্র), যামলাষ্টক (ব্রহ্মযামল, বিষ্ণুযামল, রুদ্রযামল, লক্ষ্মীযামল, উমাযামল, স্কন্দযামল, গণেশযামল ও জয়দ্রথযামল), চন্দ্রজ্ঞান, বাসুকি (পাঠান্তরে মালিনী), মহাসম্মোহন, মহোচ্ছুষ্ম (পাঠান্তরে বামজুষ্ট অর্থাৎ বামকেশ্বর), বাতুল, বাতুলোত্তর, হৃদ্ভেদ, তন্ত্রভেদ, গুহ্য, কামিক, কলাবাদ, কলাসার, কুব্জিকামত, তন্ত্রোত্তর, বীণা, ত্রোতল, ত্রোতলোত্তর, পঞ্চামৃত, রূপভেদ, ভূতোড্ডামর, কুলসার, কুলোড্ডীশ, কুলচূড়ামণি, সর্ব্বজ্ঞানোত্তর, মহাকালীমত, মহালক্ষ্মীমত, সিদ্ধযোগেশ্বরীমত, কুরূপিকামত, দেবরূপিকামত, সর্ববীরমত, বিমলামত, পূর্ব্বাম্নায়, পশ্চিমাম্নায়, দক্ষিণাম্নায়, উত্তরাম্নায়, ঊর্ধ্বাম্নায়, বৈশেষিক, জ্ঞানার্ণব, বীরাবলি, অরুণেশ, মোহিনীশ ও বিশুদ্ধেশ্বর।

এই চৌষট্টিখানা তন্ত্রের মধ্যে কতকগুলি গ্রন্থে কৌলমার্গীয় শ্রীবিদ্যার উপাসনাপদ্ধতি এবং কতকগুলিতে অপর দেবতার উপাসনাপদ্ধতি বিবৃত হইয়াছে। এইহেতু এই চৌষট্টিখানার নাম কুল-তন্ত্র। শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য তৎকৃত আনন্দলহরীতে (৩১ শ্লোক) এই চৌষট্টিখানা তন্ত্রেরই উল্লেখ করিয়াছেন—

চতুঃষষ্ট্যা তন্ত্রৈঃ সকলমভিসন্ধায় ভুবনম্।

সূতসংহিতার যজ্ঞবৈভবখণ্ডে উক্ত হইয়াছে—লীলাবিগ্রহধারী সদাশিব-রূপ পরম শিবের নাভির অধোভাগের নাম অধঃস্রোত। সেই অংশ হইতে যে সকল তন্ত্রের উদ্ভব, সেইগুলির নাম অধঃস্রোতোদ্ভব। আর সদাশিবের সদ্যোজাত, বামদেব, অঘোর, তৎপুরুষ ও ঈশান এই পাঁচটি মুখ হইতে উদ্ভূত তন্ত্রগুলি 'কামিক' প্রভৃতি বিভিন্ন সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়াছে। এইগুলি ঊর্দ্ধস্রোতোদ্ভব।

সূতসংহিতার টীকাকার মাধবাচার্যের উদ্ধৃত তন্ত্রবচন ও তত্ত্বপ্রকাশের টীকাকার শ্রীকুমারের উদ্ধৃত বচন হইতে জানা যায়—কামিকসংহিতা, যোগজ-সংহিতা, চিন্ত্যসংহিতা, কারণসংহিতা ও অজিতসংহিতা—এই তন্ত্রপঞ্চক সদাশিবের সদ্যোজাত-নামক পূর্ব মুখ হইতে অবতারিত। দীপ্তসংহিতা, সূক্ষ্মসংহিতা, সহস্রসংহিতা, অংশুমৎসংহিতা ও সুপ্রভেদসংহিতা—এই তন্ত্রপঞ্চক বামদেব-নামক উত্তর মুখ হইতে অবতারিত। বিজয়সংহিতা, নিঃশ্বাসসংহিতা, স্বায়ম্ভুবসংহিতা, পরসংহিতা ও বীরসংহিতা—এই তন্ত্রপঞ্চক অঘোর-নামক দক্ষিণ মুখ হইতে অবতারিত। রৌরবসংহিতা, মুকুটসংহিতা, বিমল-সংহিতা, চন্দ্রজ্ঞানসংহিতা এবং বিম্বসংহিতা এই তন্ত্রপঞ্চক তৎপুরুষ-নামক পশ্চিম মুখ হইতে অবতারিত। প্রোদ্গীতসংহিতা, ললিতসংহিতা, সিদ্ধসংহিতা, সন্তানসংহিতা, সর্বোক্তসংহিতা, পারমেশ্বরসংহিতা, কিরণসংহিতা ও বাতুল-সংহিতা—এই তন্ত্রাষ্টক ঈশান-নামক ঊর্দ্ধ্ব মুখ হইতে অবতারিত। এই আঠাশ-খানা শৈবাগমই প্রধান।

শ্রদ্ধেয় অধ্যক্ষ ডাঃ প্রবোধচন্দ্র বাগচী মহাশয় তাঁহার ***Studies in the Tantras*** গ্রন্থের পরিশিষ্টে নেপাল-দরবারের লাইব্রেরীর সম্মোহ তন্ত্র হইতে পাঠ উদ্ধার করিয়া দেখাইয়াছেন, চীনদেশে একশতখানি প্রধান তন্ত্র এবং সাতখানি উপতন্ত্র আছে। দ্রাবিড়ে বিশখানা মূল তন্ত্র এবং পঁচিশখানা উপতন্ত্র প্রচলিত। জৈনদের মধ্যে আঠারখানা মূল তন্ত্র এবং কুড়িখানা উপতন্ত্রের প্রচলন। কেরলে ষাটখানি প্রধান তন্ত্র এবং পাঁচশত উপতন্ত্র চলিতেছে। গৌড়ে সাতাশখানা মূল আর ষোলখানা উপতন্ত্র।

এই সম্মোহ-তন্ত্রেরই ষষ্ঠ পটলে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের তন্ত্রের বিভাগ প্রদর্শিত হইয়াছে। শৈব ও শাক্ত সিদ্ধান্ত প্রায় একই রকমের। এইহেতু শৈবাগম

ও শাক্তাগমে পার্থক্য খুবই অল্প। এইগুলির মূল ভিত্তি ও দার্শনিক সিদ্ধান্তেও অনেকাংশেই মিল রহিয়াছে।

তান্ত্রিকগণ মনে করেন, চৌষট্টিখানা ভৈরবাগম আছে। আগমগুলি শিবের যোগিনীমুখ (?) হইতে অবতারিত। এই আগমগুলিতে শিবাদ্বয়-বাদই বিঘোষিত হইয়াছে। দশখানা শৈবাগম শিবশক্তি-তত্ত্বের সিদ্ধান্তে ভরপুর। আর আঠারখানা রৌদ্রাগম শৈব ও শাক্ত উভয়বিধ সিদ্ধান্তে মিশ্রিত।[১]

স্বচ্ছন্দতন্ত্র, মালিনীবিজয়, বিজ্ঞানভৈরব, আগমরহস্য প্রভৃতি আগম-গ্রন্থে দার্শনিক মতবাদই বেশী দেখিতে পাওয়া যায়।

শাক্ত আগমের বিভিন্ন সম্প্রদায় আছে। তন্মধ্যে শ্রী-কুল ও কালী-কুলই প্রধান। শ্রীশব্দ দশ মহাবিদ্যার অন্তর্গত ষোড়শীদেবীর নামান্তর। শ্রী, কামেশ্বরী, ত্রিপুরাসুন্দরী প্রভৃতি ষোড়শী-দেবীরই নাম। নিরুত্তরতন্ত্রে শ্রী-কুল ও কালী-কুলের কয়েকজন দেবীর নাম উল্লিখিত আছে। যথা—

কালী তারা ছিন্নমস্তা ভুবনা মহিষমর্দিনী।
ত্রিপুটা ত্বরিতা দুর্গা বিদ্যা প্রত্যঙ্গিরা তথা॥
কালীকুলং সমাখ্যাতং শ্রীকুলঞ্চ ততঃ পরম্।
ধূমাবতী চ মাতঙ্গী বিদ্যা স্বপ্নাবতী প্রিয়ে।
মধুমতী মহাবিদ্যা শ্রীকুলং পরিভাষিতম্॥

কালী-কুলের আগমের সংখ্যা কম। এই সম্প্রদায়ে কুব্জিকামত এবং তারা বা নীল-সরস্বতীর প্রকরণই বেশী বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল।

কথিত আছে—অগস্ত্য, দুর্বাসা, দত্তাত্রেয় প্রমুখ মুনিগণ শ্রীবিদ্যার উপাসক ছিলেন। তাঁহারা শ্রীকুলের গ্রন্থাদিও লিখিয়া গিয়াছেন। অগস্ত্যের 'শক্তিসূত্র', 'শক্তিমহিম্নঃস্তোত্র', দুর্বাসার পরশম্ভুস্তোত্র, ললিতাস্তবরত্ন, দত্তাত্রেয়কৃত দত্তাত্রেয়সংহিতা শ্রী-কুলের প্রমাণ গ্রন্থ। আচার্য শঙ্করের পরমগুরু গৌড়পাদাচার্যও 'শ্রীবিদ্যারত্নসূত্র' নামে শ্রীবিদ্যাপদ্ধতি লিখিয়াছিলেন।

কালী-কুলের প্রসিদ্ধ গ্রন্থের মধ্যে কুব্জিকামত, কালজ্ঞান, কালোত্তর,

---

১. শাক্তাগম বিষয়ে মহামহোপাধ্যায় গোপীনাথ কবিরাজ মহাশয়ের 'Sakta philosophy' প্রবন্ধটি দ্রষ্টব্য। গ্রন্থ—*History of philosophy, Eastern and Western.*

মহাকালসংহিতা, ব্যোমকেশসংহিতা, জয়দ্রথ-যামল, উত্তরতন্ত্র, শক্তিসঙ্গমতন্ত্র, কালীতন্ত্র, নীলতন্ত্র, তোড়লতন্ত্র প্রভৃতির নামই প্রথমতঃ করিতে হয়।

সম্প্রতি তান্ত্রিক নিবন্ধসমূহের যেগুলি পাওয়া যায়, তন্মধ্যে ব্রহ্মানন্দ গিরির তারারহস্য ও শাক্তানন্দতরঙ্গিণী, পূর্ণানন্দ গিরির শ্রীতত্ত্বচিন্তামণি, শাক্তক্রম ও শ্যামারহস্য, গৌড়ীয় শঙ্করাচার্যের তারারহস্য-বৃত্তিকা, জগদানন্দ মিশ্রের কৌলার্চনদীপিকা, সর্বানন্দের সর্বোল্লাস-তন্ত্র, শ্রীকৃষ্ণ বিদ্যাবাগীশের তন্ত্ররত্ন, কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশের তন্ত্রসার প্রভৃতি নিবন্ধ-গ্রন্থ বিশেষ প্রমাণ বলিয়া গৃহীত হয়। তন্ত্রসার গ্রন্থখানি গীতা, চণ্ডী, ভাগবত প্রভৃতি ধর্মগ্রন্থের ন্যায় বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে পূজা পাইয়া আসিতেছে। আগমবাগীশের বৃদ্ধ-প্রপৌত্র রামতোষণ বিদ্যালঙ্কার খড়দহের প্রাণকৃষ্ণ বিশ্বাসের অর্থব্যয়ে যে প্রাণতোষণী-গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাও তন্ত্রনিবন্ধে বিশেষ মূল্যবান্। ভূস্বামী হরকুমার ঠাকুরের অর্থব্যয়ে পণ্ডিতমণ্ডলী-কর্তৃক লিখিত নিবন্ধ হরতত্ত্বদীধিতি গ্রন্থখানি বিশেষ সারগর্ভ। এই নিবন্ধগুলি বাঙ্গালী তান্ত্রিক সাধক ও পণ্ডিতগণের বিরচিত।

প্রপঞ্চসার, রামার্চনচন্দ্রিকা, মন্ত্রমুক্তাবলী, ভুবনেশ্বরীপারিজাত, শারদাতিলক, ত্রিপুরাসারসমুচ্চয়, তন্ত্রমন্ত্রপ্রকাশ, সোমভুজাবলী, তারাভক্তি-সুধার্ণব প্রভৃতি সুপ্রসিদ্ধ আগম-নিবন্ধগুলি বাঙ্গালার তন্ত্রসার হইতেও অনেক প্রাচীন।

কাশ্মীরের শৈবাচার্য অভিনব গুপ্তের তন্ত্রালোক, তন্ত্রসার প্রভৃতি বিখ্যাত গ্রন্থ। এই মহাপুরুষ দশম শতাব্দীর গ্রন্থকারদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছেন। মালিনীবিজয়বর্তিকা, পরাত্রিংশিকা-বিবরণ, প্রত্যভিজ্ঞাবিমর্শিণী প্রভৃতিও তাঁহার উপাদেয় রচনা।

কাশ্মীরের ক্ষেমরাজ, জয়তীর্থ প্রমুখ পণ্ডিতগণের টীকা-গ্রন্থাদিও বিশেষ প্রসিদ্ধি অর্জন করিয়াছে। গোরক্ষ, পুণ্যানন্দ, নটনানন্দ, অমৃতানন্দ প্রমুখ কাশ্মীরী গ্রন্থকারের গ্রন্থাদি বিরলপ্রচার হইলেও একসময়ে ইঁহাদের যথেষ্ট প্রতিপত্তি ছিল। শারদাতিলককার কান্যকুব্জদেশীয় লক্ষ্মণ দেশিকের পাণ্ডিত্যও অসাধারণ। দাক্ষিণাত্যের বীজাপুর নগরে খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে (১৭২৭—১৭৪০) মহাকৌল ভাস্কর রায় বা ভাস্বরানন্দের আবির্ভাব। শৃঙ্গেরি মঠে বিভিন্ন শাস্ত্র অধ্যয়নের পর তিনি সুরাটের তান্ত্রিক সাধক শিবদত্ত শুক্লের

নিকট দীক্ষিত ও পূর্ণাভিষিক্ত হন। তিনি তন্ত্রশাস্ত্রে বহু নিবন্ধ লিখিয়া গিয়াছেন। ব্রহ্মাণ্ডপুরাণের উত্তর-খণ্ডান্তর্গত ললিতা-সহস্রনামের 'সৌভাগ্য-ভাস্কর'-নামক ভাষ্য, মার্কণ্ডেয়-চণ্ডীর 'গুপ্তবতী' টীকা, 'সেতুবন্ধ' নামে বামকেশ্বর তন্ত্রের টীকা এবং 'রবিবস্যারহস্য'-নামক নিবন্ধ গ্রন্থই ভাস্কর রায়ের শ্রেষ্ঠ অবদান। এইপ্রকার তন্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত অতি অল্পই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। রাঘবভট্ট, লক্ষ্মীধর প্রমুখ টীকাকারগণের টীকাগ্রন্থও প্রমাণরূপে গৃহীত হইয়া থাকে।

আচার্য শঙ্করের প্রপঞ্চসারতন্ত্র এবং আনন্দলহরী (সৌন্দর্যলহরী) সাধক ও পণ্ডিতগণের অনর্ঘ রত্ন। শঙ্করশিষ্য পদ্মপাদাচার্যের প্রণীত টীকাই প্রপঞ্চসারের টীকাসমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

মিথিলাতেও বহু তান্ত্রিক নিবন্ধ রচিত হইয়াছিল। তন্মধ্যে নৃসিংহ ঠক্কুরের 'তারাভক্তিসুধার্ণব' একখানা উপাদেয় নিবন্ধ। নেপালের মহারাজ প্রতাপশাহের সঙ্কলিত 'পুরশ্চর্যার্ণবের' আদরও পণ্ডিতসমাজে কম নহে। মহীধরের 'মন্ত্রমহোদধি' গ্রন্থও বিশেষ প্রমাণ।

মধ্বাচার্য, মাধবাচার্য, শ্রীকণ্ঠাচার্য, শ্রীধরস্বামী, রঘুনন্দন ভট্টাচার্য প্রমুখ সুপ্রসিদ্ধ শাস্ত্রকারগণ আপন আপন গ্রন্থে শ্রদ্ধাসহকারে তন্ত্রশাস্ত্রের অনেক বচন উদ্ধার করিয়াছেন। অনতিকাল পূর্বেও বাঙ্গালার গৌরব অশেষ-শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয় তাঁহার প্রতিভাদীপ্ত ব্রহ্মসূত্র-শক্তিভাষ্যে তন্ত্রশাস্ত্রকেই বিশেষভাবে অবলম্বন করিয়াছেন।

তন্ত্রশাস্ত্রের প্রতি আজকাল বাঙ্গালী শিক্ষিত সমাজের দৃষ্টি পড়িয়াছে। পাশ্চাত্ত্য-দেশীয় বিচারপতি স্যর জন্ উড্রফ্ একজন প্রসিদ্ধ তন্ত্রামোদী ছিলেন। তাঁহার চেষ্টায়ও তন্ত্রের অনেক গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে।

কুমারখালির সাধক পণ্ডিত শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব এবং খানাকুল কৃষ্ণনগরনিবাসী অটলবিহারী ঘোষ প্রমুখ মহাশয়গণও তন্ত্রগ্রন্থ প্রচারে বিশেষ উৎসাহী ছিলেন। ঢাকা, মানিকগঞ্জের রসিকমোহন চট্টোপাধ্যায় মহাশয় অনেকগুলি তন্ত্রগ্রন্থ প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। তন্ত্রসেবক বাঙ্গালীসমাজ তাঁহাদিগকে শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ করেন।

ভারতীয় হিন্দু সাধক-সম্প্রদায়ের ভিতর তন্ত্রমার্গের সাধকই বেশী। শোনা যায়, আচার্য শঙ্কর তান্ত্রিক পদ্ধতিতেই শ্রীবিদ্যার (ত্রিপুরাসুন্দরী) উপাসনা

করিতেন। সকল শঙ্করমঠেই শ্রী-যন্ত্র স্থাপিত আছেন। মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যও শঙ্কর-সম্প্রদায়ের ঈশ্বরপুরী হইতে দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনিও তান্ত্রিক মন্ত্রেই দীক্ষিত। আচার্য অদ্বৈত, প্রভুপাদ নিত্যানন্দ প্রমুখ চৈতন্য-পরিকর আচার্যগণ তান্ত্রিক উপাসনায়ই সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়। এখনও তাঁহাদের বংশধরগণ তন্ত্রমতেই দীক্ষা গ্রহণ করেন এবং দীক্ষা দিয়া থাকেন। রাঢ়দেশের সাধক ব্রহ্মানন্দ, ময়মনসিংহের ঠাকুর পূর্ণানন্দ গিরি, ত্রিপুরার মেহার কালীবাড়ীর দশ-মহাবিদ্যাসাধক সর্বানন্দ ঠাকুর, ঢাকা মিতরার রাঘবানন্দ—ইঁহারা সকলেই তান্ত্রিক সাধনায় সিদ্ধ। নবদ্বীপবাসী তন্ত্রসারকৃৎ কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশও সিদ্ধপুরুষ ছিলেন। হালিসহরের রামপ্রসাদ ও বর্ধমানের কমলাকান্তের শ্যামাসঙ্গীত এখনও বাঙ্গালীর প্রাণে ভক্তিরসের বন্যা ছুটায়। ইঁহারা তান্ত্রিক সাধকই ছিলেন। দক্ষিণেশ্বরের রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব, তদীয় গুরু সাধিকা ভৈরবী যোগেশ্বরী, নাটোরের মহারাজা রামকৃষ্ণ, বীরভূম তারাপীঠের বীর সাধক বামাক্ষেপা, ঢাকা রমনার ব্রহ্মাণ্ডগিরি—ইঁহারা সকলেই এক পথের পথিক। ইঁহাদের নাম বাঙ্গালা দেশের সকলের নিকট সুপরিচিত। কিন্তু বঙ্গদেশে আর তান্ত্রিক সাধক ছিলেন না, বা নাই—এরূপ মনে করা যাইতে পারে না। সাধারণের চক্ষুর অন্তরালে আরও বহু গুপ্ত সাধক এখনও তাঁহাদের সাধনাকে উজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছেন। জিজ্ঞাসু শিষ্য ব্যতীত অন্যদের কাছে তাঁহারা অপ্রকাশিত। তাঁহাদের পদধূলিতে বঙ্গভূমি ধন্য হইয়াছে।

ত্রৈলঙ্গ স্বামী, রামদাস কাঠিয়া প্রমুখ মহাপুরুষগণের জীবনী পাঠ করিলেও বোঝা যায়, ইঁহারা তন্ত্রমার্গেই সাধনপথে অগ্রসর হইয়াছিলেন। জানা যায়, রাজা রামমোহন রায়ও তান্ত্রিক দীক্ষা গ্রহণ করিয়াই সাধনা করিয়াছিলেন। হরিহরানন্দ তীর্থস্বামী তাঁহার গুরু ছিলেন। এখনও সারা ভারতে তান্ত্রিক সাধনার ধারাই ব্যাপকভাবে প্রবহমান।

অধিকারী

তান্ত্রিক ক্রিয়াকাণ্ডে শ্রদ্ধালু ও আস্তিক ব্যক্তির অধিকার। বেদমার্গনিষ্ণাত ব্রাহ্মণকেও তান্ত্রিক দীক্ষা গ্রহণ করিতে হয় এবং তিন বেলা বৈদিক সন্ধ্যার পর তান্ত্রিক সন্ধ্যাও করিতে হয়। দ্বিজাতি, শূদ্র, সঙ্কর-জাতি এবং স্ত্রীলোকও তান্ত্রিক উপাসনার অধিকারী। বৈদিক ক্রিয়ায় দ্বিজাতি ব্যতীত অপর কাহারও অধিকার শাস্ত্রে উপদিষ্ট হয় নাই, কিন্তু তন্ত্র-শাস্ত্রে তথা তান্ত্রিক মার্গে সকলেরই অধিকার স্বীকৃত হইয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশ স্কন্ধে উদ্ধবোপদেশে (২৭।২৬) দেখা যায়, ঐহিক এবং পারত্রিক ফল লাভের নিমিত্ত বৈদিক ও তান্ত্রিক উভয় পদ্ধতি অনুসারেই অর্চনা করিতে হয়—

উভাভ্যাং বেদতন্ত্রাভ্যাং মহ্যং তূভয়সিদ্ধয়ে।

সুতরাং বৈদিক উপাসকের পক্ষেও তান্ত্রিক অনুষ্ঠান পরিত্যাজ্য নহে। 'তন্ত্র-শাস্ত্র বেদবিরুদ্ধ, অতএব বেদবাহ্য অন্ত্যজাদির নিমিত্তই এই সাধনা'—এই-প্রকার সিদ্ধান্ত একান্তই অজ্ঞতার নিদর্শন। তন্ত্র-শাস্ত্র বেদবিরুদ্ধ নহে এবং জাতিবর্ণ-নির্বিশেষে সকলেরই তাহাতে অধিকার আছে। বামকেশ্বর-তন্ত্রের সেতুবন্ধ-টীকার উপোদ্ঘাতে মহামতি ভাস্কর রায় এইসকল বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন।

শ্রীমদ্ভাগবতের উল্লিখিত শ্লোকের উপসংহারে পাওয়া যায়—(১১।২৭।৪৯)

এবং ক্রিয়াযোগপথৈঃ পুমান্ বৈদিকতান্ত্রিকৈঃ।
অর্চন্নুভয়তঃ সিদ্ধিং মত্তো বিন্দত্যভীপ্সিতাম্ ॥

—ঐহিক ও পারলৌকিক ফল প্রাপ্তির নিমিত্ত বৈদিক ও তান্ত্রিক, এই উভয় মার্গেই আমার অর্চনা করিবে। এই প্রকার অর্চনা দ্বারাই ঐহিক ও পারলৌকিক সিদ্ধি লাভ করিতে পারিবে।

এই উক্তি হইতেও জানা যাইতেছে, তান্ত্রিক অনুষ্ঠান বৈদিক অনুষ্ঠাতারও পরিত্যাজ্য নহে।

কাপাল প্রভৃতি শৈব তন্ত্র বেদবিরুদ্ধ—এই কথা কূর্মপুরাণ হইতে জানা যায়। যথা,

যানি শাস্ত্রাণি দৃশ্যন্তে লোকেঽস্মিন্ বিবিধানি চ।
শ্রুতিস্মৃতিবিরুদ্ধানি নিষ্ঠা তেষাং হি তামসী ॥
কাপালং পঞ্চরাত্রঞ্চ যামলং বামমার্হতম্।

* * *

ময়া সৃষ্টানি শাস্ত্রানি মোহায়ৈষাং প্রবর্ততে ॥

আচার্য ভাস্কর রায়ও সেতুবন্ধে এই কথাই বলিয়া গিয়াছেন। দুরাত্মা-দিগের মোহের নিমিত্ত সেইসকল তন্ত্র উপদিষ্ট হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে পঞ্চরাত্রের নাম গৃহীত হইলেও শ্রুতিস্মৃতি-বিরুদ্ধ পঞ্চরাত্রানুশাসনের কথাই বুঝিতে হইবে।

তান্ত্রিক সাধনায় পাণ্ডিত্যাভিমানীর অধিকার নাই। কুলার্ণব-তন্ত্রে আছে—

ব্রহ্মাদিস্তম্বপর্য্যন্তঃ যস্য মে গুরুসন্ততিঃ।
তস্য মে সর্বশিষ্যস্য কো ন পূজ্যো মহীতলে ॥

সাধক ভাবিবেন, ব্রহ্মা হইতে অতি ক্ষুদ্র তৃণগুচ্ছ (অথবা ক্ষুদ্র কীটাণু) পর্য্যন্ত সকল জীবই আমার গুরু, সকলের কাছেই কিছু না কিছু শিক্ষণীয় আছে। অতএব পৃথিবীতে কে আমার পূজ্য নন।

যদিও কৌলজ্ঞানী তান্ত্রিকের অধিকার-নির্দেশের প্রকরণে এই বচনটি উক্ত হইয়াছে, তথাপি সকল সাধকের পক্ষেই এইপ্রকার ভাবনা কল্যাণপ্রদ। বেদান্তের সাধনার বেলায়ও অনুরূপ উপদেশ দেখিতে পাই—

পাণ্ডিত্যং নির্বিদ্য বাল্যেন তিষ্ঠাসেৎ। (বৃহদারণ্যকোপনিষৎ ৩।৫)

ক্রিয়াকাণ্ডে জ্ঞান, ভক্তি ও কর্ম তিনেরই সমন্বয় ঘটে। ভক্তি এবং জ্ঞানের সহিত যোগ না থাকিলে কর্মকাণ্ডের কোন সার্থকতাই নাই। শাস্ত্রবিহিত কর্মের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধা না থাকিলে কেহই তাহাতে আকৃষ্ট হন না। কিছুটা জ্ঞান ও ভক্তি না থাকিলে শ্রদ্ধা উদ্রেকের সম্ভাবনা কোথায়? তন্ত্রালোকের টীকায় (২।৪) একটি বচন পাইতেছি, তাহাতে তন্ত্রশাস্ত্রের অধিকারী সম্বন্ধে বলা হইতেছে—

সংসারাম্বুনিধিং যঃ স্যাত্তিতীর্ষুঃ কশ্চিদুত্তমঃ।

নাত্যন্ততজ্জ্ঞো নো মূর্খঃ সোঽস্মিন্ শাস্ত্রেঽধিকারবান্॥

—যে ভাগ্যবান্ পুরুষ সংসারসমুদ্র পার হইতে চান এবং যিনি একান্ত মূর্খও নহেন, তত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতও নহেন, তিনিই তন্ত্রশাস্ত্র পাঠের অধিকারী। শাস্ত্রপাঠের অধিকার বিষয়ে যাহা বলা হইল—ক্রিয়াকর্ম অনুষ্ঠানের বেলাও এই কথাই অনেকাংশে খাটিবে। কারণ তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিরও অনুষ্ঠানের প্রয়োজন থাকে না।

দীক্ষা ও পুরশ্চরণ

দীক্ষা গ্রহণ না করিলে তান্ত্রিক কাজে অধিকার জন্মে না। পরম জ্ঞানের হেতু এবং ভবপাশচ্ছেদনের অনুকূল কর্ম-বিশেষকে 'দীক্ষা' বলে। যোগিনী-তন্ত্র প্রভৃতিতে এইরূপ ব্যুৎপত্তিই প্রদর্শিত হইয়াছে—

দায়িতে জ্ঞানমত্যর্থং ক্ষীয়তে পাশবন্ধনম্।

অতো দীক্ষেতি দেবেশি কথিতা তত্ত্বচিন্তকৈঃ॥

উপযুক্ত গুরুর নিকট হইতে তান্ত্রিক দীক্ষা গ্রহণ করিতে হয়। তান্ত্রিক উপাসনায় অদীক্ষিতের অধিকারই নাই। দীক্ষাই মোক্ষ-রূপ সৌধের প্রথম সোপান। পরমানন্দ-তন্ত্রে উক্ত হইয়াছে—

মুক্তিসৌধস্য সোপানং প্রথমং দীক্ষণং ভবেৎ।

উপনীত হইয়া গায়ত্রী-মন্ত্র গ্রহণ করাকে দীক্ষা বলা হয় না। উপনয়ন দ্বিজাতির অন্যতম সংস্কারের মধ্যে গণ্য। জিতেন্দ্রিয় সত্যবাদী শান্তচিত্ত ব্রাহ্মণকে গুরুপদে বরণ করিয়া তাঁহার নিকট হইতে তান্ত্রিক দীক্ষা গ্রহণ করিবার বিধান। দীক্ষা গ্রহণের বেলা শিষ্য যেরূপ উপযুক্ত সদ্গুরুর অন্বেষণ করিবেন, গুরুও সেইরূপ শিষ্যের সাধুতা বিশেষভাবে পরীক্ষা না করিয়া তাহাকে মন্ত্র দান করিবেন না। বৎসরাধিক কাল উভয়ে উভয়কে পরীক্ষা করিয়া কর্তব্য স্থির করিবেন। শিষ্য হইতে লব্ধ অর্থের দ্বারা পরিবার প্রতিপালন করিতে হইবে, অথবা সম্প্রদায়-বিশেষের মঠ বা আখড়া স্থাপন করিতে হইবে—ইত্যাদি অভিসন্ধিতে

শিষ্যের সংখ্যা ক্রমাগত বৃদ্ধি করা সদ্গুরুর কাজ নহে। গুরুগিরি উদরপূর্তির উপায় হিসাবে বৃত্তি-রূপে বিবেচিত হইতে পারে না। পৈতৃক কুলগুরুর বংশ হইতে দীক্ষা গ্রহণ করাই শাস্ত্রানুসারে প্রশস্ত। কুলগুরুর বংশে যদি উপযুক্ত শ্রদ্ধেয় ব্যক্তির একান্তই অভাব হয়, তবে অপর কাহাকেও বরণ করা ব্যতীত উপায় থাকে না। স্ত্রীলোক হইতেও তান্ত্রিক দীক্ষা গ্রহণ করা যাইতে পারে। শাস্ত্রে স্ত্রীগুরুরও প্রশংসা কীর্তিত হইয়াছে। গুরু হইতে যে মন্ত্র লাভ করা যায়, তাহাকেই ইষ্টমন্ত্র বলে। বিশ্বসার-তন্ত্রে উপদিষ্ট হইয়াছে—

মননাত্রাতি মন্ত্রোঽয়ং সাধকং ভববন্ধনাৎ।

অতোঽনুগীয়তে বেদৈর্মন্ত্রঃ সর্বার্থসাধকঃ॥

—মন্ত্রের মনন বা চিন্তনে সাধক ভববন্ধন হইতে মুক্ত হইতে পারেন।

মন্ত্রেই সাধকের মুক্তির বীজ নিহিত বলিয়া মন্ত্রকে বীজ-মন্ত্রও বলা হয়। গুরুকে মানুষ-রূপে, মন্ত্রকে সামান্য অক্ষর-রূপে এবং দেব-প্রতিমাকে শিলাদি-রূপে চিন্তা করিলেও পাপভাগী হইতে হয়। গুরুর দেহে পরম শিব অধিষ্ঠিত থাকিয়া শিষ্যের কল্যাণ সাধন করিতেছেন—সাধককে এইপ্রকার ভাবনা করিতে হইবে।

পরশুরাম-কল্পসূত্র হইতে জানা যায়—

মন্ত্রাণামচিন্ত্যশক্তিতা (১।৮)

—মন্ত্রের শক্তি চিন্তা বা তর্কের অতীত। মন্ত্রের মধ্যে অসাধারণ শক্তি নিহিত থাকে। সুতরাং 'এই মন্ত্র জপ করিলে কি এরূপ ফল হইতে পারে' এইপ্রকার বিতর্ক বা সংশয় পোষণ করিলে সাধকের সাধনায় বিঘ্ন ঘটিবে। এই শ্রেণীর সংশয় সাধককে অধোগামী করিয়া থাকে। শ্রদ্ধা ও পরিপূর্ণ বিশ্বাসের সহিত সাধনপথে অগ্রসর হইলে সাধক অবশ্যই সিদ্ধি লাভ করেন—ইহাও শাস্ত্রেরই উপদেশ। গুরু, মন্ত্র, যন্ত্র ও দেবতার সহিত সাধক আপনার একত্ব অনুভব করিবেন—ইহাই তান্ত্রিক সাধনার চরম কথা। মন্ত্রে অভক্তি, অক্ষরবুদ্ধি প্রভৃতি দোষ সিদ্ধির অন্তরায়। মন্ত্র অচেতন জড় শব্দ-মাত্র নহে। মন্ত্র চেতন পদার্থ। সৌভাগ্যভাস্করে ভাস্কর রায় এইপ্রকার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। বরিবস্যারহস্যেও (১০২) তিনিই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন—

ইত্থং মাতা বিদ্যা চক্রং স্বগুরুঃ স্বয়ঞ্চেতি।
পঞ্চানামপি ভেদাভাবো মন্ত্রস্য কৌলিকার্থোঽয়ম্ ॥

প্রমাতা (শিব), ইষ্টদেবতা, তাঁহার চক্র (মন্ত্র ইত্যাদি) গুরু এবং সাধক এই পাঁচের ভেদাভাব অর্থাৎ অভেদই মন্ত্রের গূঢ়ার্থ।

লব্ধ মন্ত্রকে অতিশয় গোপনীয় জ্ঞান করিতে হয়। কখনও কাহারও নিকট প্রকাশ করিতে নাই। তান্ত্রিক সাধকগণ বলেন, সকল মন্ত্রেই দুইটি শক্তি নিহিত থাকে। একটি বাচ্য শক্তি, অপরটি বাচক শক্তি। মন্ত্রের প্রতিপাদ্য দেবতাই মন্ত্রনিষ্ঠ বাচ্য শক্তি এবং মন্ত্রময়ী দেবতাই বাচক শক্তি। বীজ যেরূপ ফলের অন্তরেই নিহিত থাকে, বাচ্য শক্তিও সেইরূপ বাচক শক্তির অন্তর্নিহিত। ফলের বহিরাবরণ ভেদ না করিলে অভ্যন্তরের বীজকে লক্ষ্য করা যায় না, সেইভাবে বাচক শক্তির আরাধনা না করিলে বাচ্য শক্তির স্বরূপ জানিতে পারা যায় না। বাচ্য শক্তির সামর্থ্যে মন্ত্র জীবিত থাকে এবং বাচক শক্তির সামর্থ্যে রক্ষিত হয়। সুতরাং এই উভয় শক্তির একটিকেও বাদ দিবার উপায় নাই। একটিকে বাদ দিলেই মন্ত্র নির্বীর্য হইয়া যাইবে। মন্ত্রকে অক্ষর-রূপে মনে না করিবার আরও হেতু আছে। অক্ষরাত্মক মন্ত্র শব্দব্রহ্মের প্রতীক মাত্র। আচার্য অভিনবগুপ্ত তন্ত্রালোক (৩।৯৮—৩।১০০) বলিয়াছেন, অক্ষরজ্ঞান-রূপ সংবিদের অধিষ্ঠাতা স্বয়ং মহেশ্বর। শব্দ এবং অক্ষরসমূহ তাঁহারই শক্তি। তাঁহাতে অনন্ত শক্তি-বৈচিত্র্যের উদয় এবং লয় হইতেছে। আর অক্ষরসমূহের মধ্যে তদীয় শক্তিত্ব-রূপ একই সাধারণ ধর্ম আছে বলিয়া প্রতীক-রূপ অক্ষরসমূহেরও আত্যন্তিক ভেদ নাই। এই দৃষ্টিতে বিচার করিলে বোঝা যায়—প্রণবাদি সকল বীজ মন্ত্রই তাঁহার বাচক। যেহেতু তন্ত্রমতে শক্তি ও শক্তিমানের মধ্যে আত্যন্তিক ভেদ স্বীকৃত হয় নাই।

আচার্য অভিনবগুপ্ত দীক্ষা সম্বন্ধেও তাঁহার তন্ত্রালোকে দুই চারিটি অভিনব সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—মুক্তির হেতুভূত বুদ্ধিনিষ্ঠ জ্ঞানও শাস্ত্রজ্ঞান ব্যতীত জন্মিতে পারে না। যে-সকল শাস্ত্র এই তত্ত্বের প্রদর্শক নহে, সেই সকল শাস্ত্র হইতে আগম-শাস্ত্র শ্রেষ্ঠ। শাস্ত্র বলিতেছেন, দীক্ষা গ্রহণ করিলেই পৌরুষ (আত্মনিষ্ঠ) অজ্ঞান নিবৃত্ত হইয়া যায়। দীক্ষার এইরূপ অনির্বচনীয়

শক্তি। পৌরুষ অজ্ঞান বিনষ্ট হইলেও বুদ্ধিনিষ্ঠ অজ্ঞান নিবৃত্ত হয় না। বুদ্ধিগত অজ্ঞান নিবৃত্ত না হওয়া পর্যন্ত আত্মা সম্পূর্ণ মুক্ত হইতে পারেন না। দীক্ষা গ্রহণ-মাত্রই পৌরুষ অজ্ঞান নিবৃত্ত হয় বলিয়া দেহ-নাশের পর মুক্তির পথে আর কোন প্রতিবন্ধক থাকে না। অর্থাৎ প্রত্যেক দীক্ষিত ব্যক্তিরই মুক্তি অবধারিত। শ্রীমন্নিশাটন-শাস্ত্রে ধাতা এই কথা বলিয়াছেন। (তন্ত্রালোক ১।৫০, ৫১)

'মুক্তিশ্চ শিবদীক্ষণাৎ' ইত্যাদি আগমবচন হইতে জানা যায়, দীক্ষাদি ক্রিয়াও মুক্তির হেতু হইয়া থাকে। জ্ঞানই মুক্তির একমাত্র হেতু। সেই জ্ঞান দীক্ষা হইতেও উৎপন্ন হয়। দীক্ষা-গ্রহীতার জ্ঞান যেরূপ তাঁহার মুক্তির কারণ হয়, সেইরূপ দীক্ষাপ্রদাতা গুরুর জ্ঞানও দীক্ষাগ্রহীতা শিষ্যের মুক্তির কারণ হইতে পারে। যেহেতু, আত্মনিষ্ঠ জ্ঞানই স্বকীয় মুক্তির হেতু—এইপ্রকার কোন নিয়ম নাই। জ্ঞান বা সংবিৎ প্রকৃত-পক্ষে একই বস্তু। আপন ও পর ইত্যাদি আভাস বা কল্পনা-মাত্র। সেই আভাসের যোগে জ্ঞান স্ফুরিত হইয়া থাকে। গুরু এবং শিষ্যের মধ্যে ভেদও আভাস-মাত্র।

গুরুশিষ্য-বিষয়ে আরও কিছু জানিবার আছে। জ্ঞানের যে একত্ব স্ফুরণের কথা বলা হইল, শিষ্য ও গুরুর মধ্যে দীক্ষা দ্বারা সেই একাত্মতা বোধই জাগ্রত হয়। শিষ্যের সহিত যে গুরুর একাত্মকতা বুদ্ধি স্ফুরিত হয়, তিনিই সিদ্ধ এবং মুক্ত বলিয়া কীর্তিত হইয়াছেন।

গুরুর শিষ্য-প্রশিষ্যাদি সকলই গুরু হইতে অভিন্ন। এক একটি শিষ্যপ্রশিষ্য-পরম্পরায় একই সংবিৎ স্ফুরিত হইয়া থাকে। শিষ্য-প্রশিষ্যাদির মুক্তিই প্রকৃত-পক্ষে গুরুর মুক্তি। গুরু-শিষ্যের ভেদ শুধু কাল্পনিক। শিষ্য-প্রশিষ্য প্রভৃতিকে লইয়াই গুরুর সত্তা এবং একত্ব।

কেহ কেহ বলিয়া থাকেন, দীক্ষা একপ্রকার ক্রিয়া বা অনুষ্ঠান-মাত্র। অনুষ্ঠান কিরূপে মুক্তির কারণ হইতে পারে, মুক্তির কারণ তো জ্ঞান? উত্তরে বলা হইতেছে, জ্ঞান ও ক্রিয়া একই পদার্থ। অতএব জ্ঞান হইতে মুক্তি, অথবা ক্রিয়া বা অনুষ্ঠান হইতে মুক্তি—একই কথা। (তন্ত্রালোক ১।২৩১—২৩৮) এই আলোচনা হইতে বোঝা যাইতেছে, দীক্ষা গ্রহণ করিয়া শিষ্য জপ-তপ প্রভৃতি না করিলেও শুধু গুরুদত্ত মন্ত্রই তাঁহার অশেষ কল্যাণ সাধন করে। অনেকে হয়তো এইপ্রকার সিদ্ধান্তে সন্দেহ পোষণ করিবেন। কিন্তু আচার্য

অভিনবগুপ্ত আগম-বচনের উপর নির্ভর করিয়াই এই সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইয়াছেন। এই অভিমত আর কোথাও পাইয়াছি বলিয়া মনে পড়ে না।

দীক্ষাগ্রহণের পর মন্ত্রকে ত্যাগ করিতে নাই, এবং কখনও গুরুর প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশ করিতে নাই।

গুরুমন্ত্রপরিত্যাগাদ্ রৌরবং নরকং ব্রজেৎ।

(রুদ্রযামল, দ্বিতীয় পটল)

যেহেতু মন্ত্র শব্দস্বরূপ, সেইহেতু মন্ত্রবিষয়ে গুরুর দাতৃত্ব এবং শিষ্যের গ্রহীতৃত্ব কিরূপে সম্ভবপর হইতে পারে—এইপ্রকার আপত্তির খণ্ডনপ্রসঙ্গে তান্ত্রিকগণ বলিয়া থাকেন, গুরু মনে করেন—'আমার উচ্চারণের পরে শিষ্যের উচ্চারিত এই মন্ত্রটি তাহার চতুর্বর্গ ফল-প্রাপ্তিরূপ অভিলাষ পূর্ণ করুক।' এইপ্রকার গুরুর ইচ্ছাই তাঁহার মন্ত্রদাতৃত্ব। মন্ত্রটিকে উপাস্য-রূপে শ্রদ্ধালু শিষ্য স্বীকার করিলেই মন্ত্র গৃহীত হইল। অতএব শব্দের দাতৃত্ব ও গ্রহীতৃত্ব বিষয়ে কোনরূপ অসঙ্গতি ঘটে না।

কুলগুরুকে ত্যাগ করিয়া নূতন কাহাকেও গুরুত্বে বরণ করিতে হইলে নূতন গুরু শিষ্য অপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠ হইবেন, ইহা শাস্ত্রের অভিপ্রায়। কুলগুরু সম্বন্ধে এই নিয়ম খাটিবে না।

যে-কোন এক দেবতার মন্ত্র গ্রহণ করিলেই সকল দেবতার উপাসনা ও মন্ত্রাদি-দানে অধিকার জন্মে। পুনঃ পুনঃ দীক্ষা গ্রহণ করিতে হয় না।

একমন্ত্রদীক্ষণং হি সর্বমন্ত্রেঽধিকারিতা। (পিচ্ছিলাতন্ত্র)

দীক্ষাগ্রহণে গুরুর সহিত শিষ্যের যে সম্বন্ধ হয়, তাহাতে গুরু লোকান্তরিত হইলে শিষ্যকে তিন দিন অশৌচ পালন করিতে হয়। মৎস্যসূক্তে উল্লিখিত হইয়াছে—

গৃহীতো দেবতামন্ত্রঃ সাবিত্রীগ্রহণং কৃতম্।
যস্মাত্তস্য ত্রিরাত্রন্তু রক্ষেদ্বিদ্যাগ্রহো যতঃ॥

দীক্ষা প্রধানতঃ তিনপ্রকার—শাম্ভবী, শাক্তী ও মান্ত্রী। গুরু, শিষ্যের মস্তকে তাঁহার ইষ্টদেবতার চরণের ধ্যান করিয়া তাহা হইতে প্রচ্যুত অমৃতের দ্বারা শিষ্যের বাহিরের ও অন্তরের মলকে অপসারিত করিবেন—ইহাই শাম্ভবী দীক্ষা।

গুরু, শিষ্যের মূলাধার হইতে ব্রহ্মরন্ধ্র পর্যন্ত দীপ্তিশালিনী বহ্নিতুল্যা প্রকাশলহরীর ভাবনা করিবেন, এবং তাহার প্রভা দ্বারা শিষ্যের দুষ্কৃতি ও দুরিত বিনাশ করিবেন। এই শক্তিপ্রবেশ-রূপ দীক্ষাই শাক্তী দীক্ষা।

শাস্ত্রীয় পদ্ধতি অনুসারে শিষ্যকর্ণে বীজ মন্ত্র প্রদানের নাম মান্ত্রী দীক্ষা। মান্ত্রী দীক্ষা নানা-প্রকারের। বঙ্গদেশে কলাবতী [১] দীক্ষারই প্রচলন বেশী।

উমানন্দ-কৃত নিত্যোৎসবে এইসকল বিষয়ে অনেক তথ্য উপদিষ্ট হইয়াছে। দীক্ষাপ্রদানের সময় গুরুকে কতকগুলি শাস্ত্রীয় চক্রের বিচার করিতে হয়। যথা—কুলাকুলচক্র, রাশিচক্র, নক্ষত্রচক্র, অকথহচক্র, অকডমচক্র, ঋণীধনীচক্র ইত্যাদি। মহাবিদ্যার এবং গোপালের মন্ত্রদানে চক্রবিচারের আবশ্যক নাই, ইহাও কেহ কেহ বলিয়া থাকেন। কোন্ মন্ত্র কোন্ শিষ্যের কল্যাণপ্রদ হইবে, তাহা চক্রবিচারের দ্বারা স্থিরীকৃত হয়। চক্রবিচারের বিশেষ নিয়মপ্রণালী বড়ই জটিল। গুরুর উপদেশ ব্যতীত পরিষ্কার ধারণা করা যায় না।

দীক্ষা প্রদানের পূর্বে গুরুকে মন্ত্রের দশবিধ সংস্কার সাধন করিতে হয়। সংস্কার ব্যতীত মন্ত্র ফলদায়ক হয় না। দশবিধ সংস্কার যথা—

জননং জীবনং পশ্চাত্তাড়নং বোধনন্তথা।
তথাভিষেকো বিমলীকরণাপ্যায়নে পুনঃ॥
তর্পণং দীপনং গুপ্তির্দশৈতা মন্ত্রসংস্ক্রিয়াঃ॥ (গৌতমীয় তন্ত্র)

মন্ত্রসিদ্ধির নিমিত্ত আগমশাস্ত্রে পুরশ্চরণের ব্যবস্থা আছে। মেরুতন্ত্রে পুরশ্চরণ-শব্দের অর্থ কথিত হইয়াছে—

ধর্মার্থকামমোক্ষাণাং সাধনং মন্ত্র উচ্যতে।
তৎসিদ্ধয়ে পুরো যচ্চ চর্যতে তৎ প্রকীর্তিতম্।
পুরশ্চরণ-কর্মাখ্যং বেদাদৌ শাবরান্তকে॥

—মন্ত্র ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ—এই চতুর্বর্গের সাধন। অর্থাৎ মন্ত্র জপ করিলে চতুর্বর্গ লাভ করা যায়। মন্ত্রের শক্তি বৃদ্ধি করিয়া চতুর্বর্গ-রূপ ফল লাভ করিতে প্রথমতঃ (অথবা দেবতার সাক্ষাতে) যে কর্মের অনুষ্ঠান করা হয়, তাহাকেই

---

১. বহ্নির দশ কলা, সূর্যের দ্বাদশ কলা এবং সোমের ষোড়শ কলার আবাহন, পূজা ইত্যাদি-সম্বলিত পদ্ধতি। দ্রষ্টব্য—তন্ত্রসার।

পুরশ্চরণ বলে। গায়ত্রী মন্ত্রেরও পুরশ্চরণের ব্যবস্থা আছে। অতএব বেদাদি শাবর-শাস্ত্র (বামাচারের অন্তর্গত আচার-বিশেষ) পর্যন্ত সর্বত্রই পুরশ্চরণের বিধান পাওয়া যায়। জপ, হোম, তর্পণ, অভিষেক ও ব্রাহ্মণ-ভোজন—এই পঞ্চাঙ্গ কর্মকে পুরশ্চরণ বলে। পুরশ্চরণ ব্যতীত মন্ত্র সম্পূর্ণ ফলপ্রদানে সমর্থ হয় না। সাধক স্বয়ং কিংবা গুরুর দ্বারা পুরশ্চরণ করিবেন।

পুণ্যক্ষেত্র, নদীতীর, পর্বতগুহা, তীর্থক্ষেত্র, বিল্বমূল, নির্জন অরণ্য, পর্বততট, গোশালা, দেবালয় প্রভৃতি স্থান পুরশ্চরণে প্রশস্ত বলিয়া কীর্তিত হইয়াছে।

তিথি নক্ষত্রের বিশেষ বিশেষ যোগে, সূর্যগ্রহণে, এবং চন্দ্রগ্রহণেও পুরশ্চরণ করিবার বিধান আছে। পুরশ্চরণে জপ, হোম, তর্পণ প্রভৃতির সংখ্যার নিয়ম শাস্ত্রে উপদিষ্ট হইয়াছে।

অভিষেক

দীক্ষাদির আলোচনা-প্রসঙ্গে অভিষেকের কথাও কিঞ্চিৎ জানা প্রয়োজন। মন্ত্রসিদ্ধির নিমিত্ত তন্ত্রোপদিষ্ট বিশেষ বিশেষ মন্ত্রে গুরু শিষ্যের মস্তকে মন্ত্রপূত জলের দ্বারা অভিষেক করেন। বামকেশ্বর-তন্ত্রে অভিষেকের বিস্তৃত বিধান পাওয়া যায়। অভিষেক দুইপ্রকার—শাক্ত এবং পূর্ণ। সাধারণতঃ দীক্ষা দানের অব্যবহিত পরেই শাক্তাভিষেক অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু পূর্ণাভিষেকের প্রচলন খুব ব্যাপক নহে। পূর্ণাভিষিক্ত তান্ত্রিক সাধক আজকাল খুব কমই দেখিতে পাওয়া যায়। অভিষেকের দ্বারা সর্ববিধ আপদ্-বিপদ্ কাটিয়া যায়, ইহাও তন্ত্রশাস্ত্রের উপদেশ —

নশ্যন্তু চাপদঃ সর্বাঃ সম্পদঃ সন্তু সুস্থিরাঃ।
অভিষেকেন শাক্তেন পূর্ণাঃ সন্তু মনোরথাঃ ॥

অভিষেকের দ্বারা সাধকের শরীর শোধিত হয়—এই কথাও বামকেশ্বর-তন্ত্র হইতেই জানা যাইতেছে।

কেহ কেহ বলিয়া থাকেন, শুধু শক্তি-সাধকের পক্ষেই অভিষেক কর্তব্য। কিন্তু বামকেশ্বর-তন্ত্র সকলপ্রকার তান্ত্রিক সাধকের কথাই বলিয়াছেন—

বৈষ্ণবো জ্ঞানসম্পন্নঃ শৈবশ্চৈব কুলেশ্বরি।
অভিষেকং প্রকুর্বীত শাক্তশ্চ কুলভূষণঃ।
মন্ত্রতন্ত্রঞ্চ সর্বেষামভিষেকেন সিধ্যতি ॥

পঞ্চোপাসনা

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য—এই তিন বর্ণের শিশুর বিশেষ বিশেষ বয়সে উপনয়নের ব্যবস্থা শাস্ত্রে বিহিত। উপনীত দ্বিজ গায়ত্রীর উপাসনা করিবেন। বৈদিক মন্ত্রে গায়ত্রীর যে উপাসনা করা হয়, তাহা নির্গুণ ব্রহ্মের উপাসনা নহে। নির্গুণের উপাসনা হইতে পারে না। এইরূপ উপাসনার ভান যুক্তি ও শাস্ত্রের বিরুদ্ধ। সগুণ মনের দ্বারা নির্গুণের ধ্যান করা যায় না। উপাসনা শব্দের অর্থই হইতেছে—সগুণ-ব্রহ্ম-বিষয়ক মানস ব্যাপার। 'আমি উপাসক, তিনি উপাস্য'—এইপ্রকার ভেদজ্ঞান না থাকিলে উপাসনাই হইতে পারে না। যত কাল এই ভেদজ্ঞান থাকিবে, তত কালই সাকারের উপাসনা করিতে হইবে। এই ভেদজ্ঞান তিরোহিত হইলে উপাস্য-উপাসক অর্থাৎ সেব্য-সেবক-ভাবই থাকে না। তখন উপাসনাও সম্ভবপর হয় না। আচার্য শঙ্করও ব্রহ্মসূত্রের (১।২।১৪ ; ৩।২।৩৩) ভাষ্যে এই কথা বিস্তৃতভাবে উল্লেখ করিয়াছেন।

দেবী গায়ত্রীর অপর নাম বেদমাতা, তিনি মহাশক্তিরূপিণী। সুতরাং সকল দ্বিজই প্রথমতঃ শক্তির উপাসনা করেন। তন্ত্রশাস্ত্র বলেন,

শাক্তা এব দ্বিজাঃ সর্বে ন শৈবা ন চ বৈষ্ণবাঃ।
উপাসতে যতো দেবীং গায়ত্রীং বেদমাতরম্ ॥

(তন্ত্রতত্ত্বধৃত ১২৭ পৃ)

ত্রৈকালিক উপাসনায় দেবীর ধ্যানে বিভিন্ন রূপের প্রকাশ। প্রাতঃকালে গায়ত্রী-দেবী রক্তবর্ণা দ্বিভুজা অক্ষসূত্র (অকারাদি-ক্ষকারান্তবর্ণমালা, রুদ্রাক্ষমালা) ও কমণ্ডলুধারিণী, হংসাধিষ্ঠিতা, কুমারী, ব্রহ্মাণী, সূর্যমণ্ডলমধ্যস্থা এবং ঋগ্বেদের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। মধ্যাহ্নে নীলোৎপলদলশ্যামা, চতুর্ভুজা, শঙ্খচক্রগদাপদ্ম-ধারিণী, গরুড়াধিষ্ঠিতা, যুবতী, সূর্যমণ্ডলমধ্যস্থা এবং যজুর্বেদের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। সায়াহ্নে শ্বেতবর্ণা, ত্রিশূলডমরুধারিণী, ত্রিনয়না, অর্ধচন্দ্রবিভূষিতা, বৃষভাসনা, বৃদ্ধা, সূর্যমণ্ডলমধ্যস্থা ও সামবেদাধিষ্ঠাত্রী দেবতা।

প্রাতঃকালে তাঁহার নাম গায়ত্রী, মধ্যাহ্নে সাবিত্রী এবং সায়াহ্নে সরস্বতী। এই তিনটি ধ্যান হইতে জানা যাইতেছে যে, গায়ত্রী দেবী ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরের শক্তিরূপিণী।

গায়ত্রী-মন্ত্রে ব্রহ্মের যে স্বরূপ প্রকাশিত হইতেছে, তাহা পঞ্চাত্মক। তিনি বিশ্বব্যাপী বিভু, তিনি জগতের স্রষ্টা, তিনি আরাধ্য, তিনি লীলাময় এবং তিনিই জীবের বুদ্ধির প্রেরয়িতা। এই গায়ত্রী-মন্ত্রের প্রতিপাদ্য বা বাচ্য ব্রহ্ম সগুণ ও নির্গুণ দুইই। সগুণ সাধনায় সিদ্ধ হইলে সাধক তাঁহার নির্গুণ তত্ত্ব জানিতে পারেন।

নির্গুণ শব্দের অর্থ গুণহীন নহে, পরন্তু গুণে নির্লিপ্ত, অর্থাৎ অসম্বদ্ধ বা অনাসক্ত—এই প্রকার অর্থই বুঝিতে হইবে।

গায়ত্রী-উপাসনায় যদিও সগুণ ব্রহ্ম উপাস্য, তথাপি নির্গুণ ব্রহ্মই সাধকের চরম উপেয়, অর্থাৎ জ্ঞেয়। আচার্য শঙ্কর তাঁহার ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে (১।১।১২, উপক্রম) বলিয়াছেন,

দ্বিরূপং হি ব্রহ্মাবগম্যতে, নামরূপবিকারভেদোপাধিবিশিষ্টং তদ্বিপরীতঞ্চ সর্বোপাধিবিবর্জিতম্।......

এবমেকমপি ব্রহ্মাপেক্ষিতোপাধিসম্বন্ধং নিরস্তোপাধিসম্বন্ধং চোপাস্যত্বেন জ্ঞেয়ত্বেন চ বেদান্তেষূপদিশ্যতে।

—ব্রহ্মের দুইটি স্বরূপ। একটি স্বরূপ নাম রূপ প্রভৃতি যুক্ত এবং অপর স্বরূপটি তাহার বিপরীত, অর্থাৎ সর্বপ্রকার উপাধিবিবর্জিত।...এইভাবে একই ব্রহ্ম (সগুণ) উপাধিযুক্ত হইয়া উপাস্য-রূপে এবং সর্ববিধ উপাধি-সম্পর্কশূন্য (নির্গুণ) হইয়া জ্ঞেয়-রূপে বেদান্তশাস্ত্রে উপদিষ্ট হইতেছেন।

ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, শক্তি ও সূর্য এই পাঁচ দেবতাই গায়ত্রী মন্ত্রের বাচ্য। সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহারের প্রতীক ত্রিমূর্তির স্বরূপ গায়ত্রীর ত্রৈকালিক ধ্যানেই পাওয়া যাইতেছে। গায়ত্রী বরদা দেবী এবং ব্রহ্মবাদিনী। ইহাতে তাঁহার শক্তিরূপতা সুস্পষ্ট। তিনি সূর্যমণ্ডল-মধ্যবর্তিনী বলিয়া উপাসনার সময় সূর্যমণ্ডলেরও ধ্যান করিতে হয়। অতএব দেখা যাইতেছে যে, ধ্যানমন্ত্র হইতেই গায়ত্রীর পঞ্চাত্মকতা জানিতে পারা যায়।

দেবর্ষি নারদের অভিসম্পাতে ব্রহ্মার তান্ত্রিক উপাসনা নিষিদ্ধ হইয়াছিল। ব্রহ্মবৈবর্ত-পুরাণে পাইতেছি—প্রজাপতি ব্রহ্মার কণ্ঠদেশ হইতে দেবর্ষি নারদের উৎপত্তি। মরীচি, বশিষ্ঠ, প্রচেতা প্রমুখ ঋষিগণের উৎপত্তিও প্রজাপতি হইতে। প্রজাপতি পুত্রগণকে আদেশ করিলেন—'বৎসগণ, সৃষ্টির কাজে তোমরা সহায় হও।' নারদ উত্তর করিলেন—'হে পিতঃ, সনক, সনন্দ প্রমুখ ঋষিগণ আমাদেরও জ্যেষ্ঠ। পূর্বে তাঁহাদিগকে বিবাহ দিয়া গৃহস্থ করুন, অতঃপর আমাদিগকে আদেশ করিবেন। এক পুত্রকে অমৃত হইতেও শ্রেষ্ঠ এবং লোভনীয় তপস্যায় নিয়োগ করিবেন, আর অপরকে বিষ হইতেও নিকৃষ্ট বিষয়-সম্ভোগের দিকে আকর্ষণ করিবেন—পিতার এইরূপ ব্যবহার কি সঙ্গত?'

পুত্রের বাক্যে পিতা কুপিত হইলেন। নারদকে শাপ দিলেন—'বৎস, আমার শাপে তোমার জ্ঞান লোপ পাইবে। তুমি যোষিল্লুব্ধ লম্পট হইয়া পঞ্চাশটি কামিনীতে আসক্ত হইবে। দীর্ঘকাল তাহাদের সহিত যথেচ্ছ বিহার করিয়া এক দাসীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিবে। পরে বৈষ্ণব-জনের সংসর্গে নিষ্পাপ হইয়া পুনরায় আমার পুত্ররূপে জন্ম লইবে।'

এই অভিসম্পাতে নারদ কাঁদিতে লাগিলেন। অকারণ শাপে কুপিত হইয়া তিনিও পিতাকে অভিসম্পাত করিলেন—'পিতঃ, আমি নিরপরাধ। বিনা কারণে আমাকে শাপ দিয়াছেন। পণ্ডিতগণও আততায়ীকে হত্যা করেন। আমিও আপনাকে প্রত্যভিসম্পাত দিতেছি। আপনার কবচ, স্তোত্র, পূজা মন্ত্র প্রভৃতি পৃথিবীতে লুপ্ত হইয়া যাইবে। এখন আপনি শুধু সুর-লোকেই বন্দনীয় থাকিবেন। মর্ত্য-লোকে আপনার কোন প্রভাব থাকিবে না।' (ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ, ব্রহ্মখণ্ড—৮ম অধ্যায়।)

এই পৌরাণিক আখ্যায়িকাকে রূপক-রূপে গ্রহণ করিলেও বলিতেই হইবে—যে-কোন কারণেই হউক কাল-ক্রমে ব্রহ্মার উপাসনার লোপ ঘটিয়াছে।

হিন্দুসমাজে গৃহদাহাদিতে বা অগ্নিভয়-নিবারণে ব্রহ্মার নাম করিয়া যে পূজা করা হয়, তাহা আসলে অগ্নি-দেবতার পূজা।

ব্রহ্মার উপাসনা রহিত হওয়ায় শাস্ত্রে ব্রহ্মার স্থানে গণেশের গ্রহণ। গায়ত্রী উপাসনার উপাস্য দেবতাই তান্ত্রিক দীক্ষিতের উপাস্য-রূপে বিহিত হইয়াছেন। সূর্যের শক্তির নাম ছায়া, গণেশের শক্তি বল্লভা, বিষ্ণুর শক্তি লক্ষ্মী এবং রুদ্রের শক্তি রুদ্রাণী। ইঁহারা শক্তি হইলেও শক্তিমান্ হইতে ভিন্ন নহেন।

বিশ্বব্যাপী, জগৎস্রষ্টা, আরাধ্য, লীলাময় এবং জীববুদ্ধিপ্রেরক—এই পাঁচটি বিশেষণ গায়ত্রী মন্ত্রের নিগূঢ়ার্থ খুঁজিলে পাওয়া যায়। উল্লিখিত তান্ত্রিক পঞ্চ দেবতার প্রত্যেকই এই বিশেষণগুলির বিশেষ্য হইয়া থাকেন। পঞ্চ দেবতার সত্তা পরব্রহ্মের বাহিরে নহে। সাধকের নিকট তাঁহার ইষ্ট-দেবতাই পূর্ণব্রহ্ম, সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহারের কর্তা। একটি শান্ত সসীম অন্তঃকরণে পাঁচটি মূর্তিকে ধ্যান করা সম্ভবপর নহে। মন বিক্ষিপ্ত হইলে সাধনা হয় না। এই কারণে ধ্যেয় বস্তু বা মূর্তি এক হওয়াই বাঞ্ছনীয়। একমাত্র মূর্তিকে অবলম্বন করিয়া সাধন-পথে অগ্রসর হইবার নিমিত্তই তান্ত্রিক উপাসনার বিশেষ প্রয়োজন। যদিও পঞ্চ দেবতার পরস্পরের মধ্যে কোনপ্রকার ভেদের স্থান নাই, তথাপি একনিষ্ঠ ভক্তের কাছে তাঁহার উপাস্যই জীবনসর্বস্ব। ভক্তপ্রবর হনুমান্ বলিয়াছিলেন—

শ্রীনাথে জানকীনাথে চাভেদঃ পরমাত্মনি।
তথাপি মম সর্বস্বং রামঃ কমললোচনঃ॥

পরমাত্ম-তত্ত্বের বিচারে শ্রীনাথ নারায়ণ এবং জানকীনাথ রামচন্দ্রের মধ্যে কোন ভেদ নাই—জানি, তথাপি কমললোচন রামচন্দ্রই আমার সর্বস্ব।

সকল মূর্তির অধিষ্ঠাতাই অদ্বিতীয় পরব্রহ্ম। সুতরাং যথার্থতঃ পরস্পরের মধ্যে কোন প্রভেদ নাই। সাকার-উপাসকের উপাস্য-ভক্তি সতীর পতিপ্রেমের মত। সাধক একের ধ্যানেই বিভোর, অন্য মূর্তির নিন্দা তিনি কখনও করিতে পারেন না। যাঁহারা নিন্দা করেন, তাঁহারা সাধক তো নহেনই, পরন্তু দুরাচার পাষণ্ড।

সাধকপ্রবর রামপ্রসাদ গাহিয়াছেন—

উপাসনাভেদে তুমি প্রধান মূর্তি ধর পাঁচ।
তোমার পাঁচ ভেঙ্গে যে এক করেছে,
তাঁর হাতে মা, কৈ বা বাঁচ॥

শিবমহিম্নঃ স্তোত্রে পুষ্পদন্ত বলিয়াছেন—

ত্রয়ী সাংখ্যং যোগঃ পশুপতিমতং বৈষ্ণবমিতি
প্রভিন্নে প্রস্থানে পরমিদমদঃ পথ্যমিতি চ।
রুচীনাং বৈচিত্র্যাদৃজুকুটিলনানাপথজুষাম্
নৃণামেকো গম্যস্ত্বমসি পয়সামর্ণব ইব॥

—বেদ, সাংখ্য, যোগ, শৈবশাস্ত্র, বৈষ্ণবশাস্ত্র প্রভৃতির বিভিন্ন পথ লইয়াই যত মতভেদ। কিন্তু প্রভো, সরল পথেই হউক, আর বাঁকা পথেই হউক—যে পথই ধরুক না কেন, নদনদীর সকল ধারাকেই পরিশেষে একমাত্র মহাসমুদ্রে মিলিত হইতে হয়। সেইরূপ সাধকগণের মধ্যেও রুচিভেদে যিনি যে সাধন-মার্গকেই অবলম্বন করুন না কেন, তুমিই সকলের চরম উপেয়।

দ্বিজগণ গায়ত্রী-মন্ত্রের উপাসক হইলেই পঞ্চোপাসনার অধিকার লাভ করেন। কিন্তু একই উপাস্যকে নিষ্ঠার সহিত উপাসনা করিবার নিমিত্ত তান্ত্রিক দীক্ষারও প্রয়োজন আছে। গায়ত্রী-মন্ত্রে যে তত্ত্বের বীজ বপন হয়, তান্ত্রিক দীক্ষায় তাহারই অঙ্কুর জন্মে।

বৈষ্ণবের বিষ্ণু, শাক্তের শক্তি এবং শৈবের শিব-দেবতার বিভিন্ন নাম ও মূর্তি লইয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সাধকগোষ্ঠীর বিভেদ আছে। বৈষ্ণব ও শাক্ত-সম্প্রদায়েই দেবতার নাম ও মূর্তির শেষ নাই। এই নাম-রূপের অনন্ততা থাকিলেও উপাসক-সম্প্রদায়গুলিকে একই বলা হয়। শাক্ত, বৈষ্ণব এবং শৈব শব্দেই তাঁহাদিগকে অভিহিত করা হয়।

বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মূলে যে শক্তি ও শক্তিমান্ অভিন্নভাবে লীলা করিতেছেন, তাহার তথ্য অর্থাৎ শিবশক্তির এই প্রগাঢ় মিলন বা সামরস্যের ধ্যান না করিয়া উপাসনা করিলে সেই উপাসনা প্রাণহীন শরীরের মত অসার। সুতা দিয়া না বাঁধিলে পুতুলকে যেমন নাচানো যায় না, সেইরূপ এই মূল লীলার কথা মনে না রাখিলেও উপাসনা সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হইয়া যায়। বরিবস্যারহস্যে এই কথাই প্রকাশিত হইয়াছে—

ব্রহ্মৈব শিবঃ শক্তিশ্চেতি প্রত্যেককূটার্থঃ।
শিবশক্তি-সামরস্যাদ্ বিদ্যায়া এষ সামরস্যার্থঃ ॥ (১২০)
এতামুৎসৃজ্য জড়ৈঃ ক্রিয়মাণা বাহ্যাড়ম্বরোপাস্তিঃ।
প্রাণবিহীনেব তনুর্বিগলিতসূত্রেব পুত্তলিকা ॥ (১৬৩)

প্রসঙ্গতঃ একটি আলোচনা করা যাইতেছে। প্রত্যেক মন্ত্রেরই জপের পর জপ-সমর্পণের বিধান আছে। মন্ত্রজপের পরে উপাসক—

গুহ্যাতিগুহ্যগোপ্তা (গোপ্ত্রী) ত্বং গৃহাণাস্মৎকৃতং জপম্।
সিদ্ধির্ভবতু মে দেব (দেবি) ত্বৎপ্রসাদান্মহেশ্বর (মহেশ্বরি) ॥

এই মন্ত্র পাঠ করিয়া তাঁহার জপের সকল ফলই উপাস্য দেবতাকে সমর্পণ করেন। কিন্তু গায়ত্রী-জপের পর সমর্পণের কোন বিধান নাই।

কেহ কেহ বলিয়া থাকেন, জপসমর্পণের ব্যবস্থা তান্ত্রিক মন্ত্র জপের সম্বন্ধে। বৈদিক মন্ত্র জপে সেই নিয়ম চলিবে না। এই সিদ্ধান্ত ঠিক কি না ভাবিবার বিষয়। কারণ পৌরাণিক ক্রিয়াকাণ্ডে কোনও দেবতার নাম জপের পরেও সমর্পণের বিধান দেখিতে পাইতেছি, এবং পূজকগণ তাহা করিয়াও থাকেন। উপাসক নিজস্ব বলিয়া কিছুই রাখিবেন না। তাঁহার জপের ফলও নিজের হাতে না রাখিয়া উপাস্য দেবতাকেই সমর্পণ করিবেন। ইহাতে উপাসকের অভিমান বা জপশ্লাঘা জন্মিতে পারে না। কর্মজনিত ফলের প্রতিও ক্রমে একটি অনাসক্তি আসে। এই কারণে এই বিধানটি খুবই সুন্দর।

কিন্তু গায়ত্রী-জপের বেলায় ব্যতিক্রম দেখিয়া মনে হয়, যেহেতু গায়ত্রী-মন্ত্রটিই আত্মসমর্পণ-স্বরূপ, সেইহেতু সমর্পণাত্মক মন্ত্রের পুনঃ সমর্পণের প্রয়োজন না থাকায় শাস্ত্রে তাহার বিধান নাই।

ধিয়ো যো নঃ প্রচোদায়াৎ—এই মন্ত্রাংশ হইতে জানা যাইতেছে, আমরা তাঁহারই ধ্যান করিতেছি, যিনি আমাদের বুদ্ধিকে পরিচালিত করেন। মন্ত্রেই তাঁহাকে বুদ্ধির (ধী) প্রেরয়িতা বলিয়া ধ্যান করা হইতেছে। ইহাতে আর নিজের বলিয়া কিছুই রহিল না। সৎ অসৎ সকল কাজই তাঁহার প্রেরণায় করিতেছি। ইহা অপেক্ষা পূর্ণ আত্মসমর্পণ আর কি হইতে পারে?

কলিযুগে মানবের শক্তি-সামর্থ্য কম, অন্নগত প্রাণ। গায়ত্রীর তাৎপর্য বুঝিয়া একের উপাসনায় মন স্থির করা দুঃসাধ্য। এইহেতু গায়ত্রীসূচিত পঞ্চ দেবতার মধ্যে একটি রূপকে অবলম্বন করিবার নিমিত্ত তান্ত্রিক সাধনার প্রয়োজন। শাস্ত্রে দেখা যায়—কলিযুগে আগমসম্মত উপাসনা প্রশস্ত এবং শীঘ্র ফলপ্রদ। প্রাত্যহিক উপাসনার বেলাও দ্বিজগণ প্রথমে বৈদিক গায়ত্রী-মন্ত্রে উপাসনা করিয়া পরে তান্ত্রিক উপাসনা করেন। শূদ্রদের উপনয়ন সংস্কার না থাকায় গায়ত্রী উপাসনায় অধিকার নাই, তাঁহারা শুধু তান্ত্রিক দীক্ষা গ্রহণ করিয়া তান্ত্রিক উপাসনাই করিবেন।

ত্রৈকালিক সন্ধ্যা-আহ্নিক ব্যতীত নিত্য পূজা-অর্চনায় হিন্দুগণ যে-সকল অনুষ্ঠান করেন, তাহাতে প্রায় আট আনা তান্ত্রিক, ছয় আনা পৌরাণিক, আর দুই আনা বৈদিক। তান্ত্রিক ক্রিয়াকলাপের বিষয় হিন্দুসমাজে সুবিদিত। যাঁহারা আনুষ্ঠানিক পূজাপদ্ধতির খবর রাখেন, তাঁহারা সকলেই তান্ত্রিক উপাসনার সহিত পরিচিত।

তন্ত্রাদি-শাস্ত্রে পরব্রহ্মের অনন্ত রূপের বর্ণনা পাওয়া যায়। এখানে প্রসঙ্গতঃ একটি জিজ্ঞাসা উদয় হওয়া স্বাভাবিক। তাহা হইতেছে—শিব, বিষ্ণু প্রমুখ পঞ্চ দেবতা এবং আরও যে-সকল দেবতার নাম জানা যায়, তাঁহাদের পরিচয় কি, এবং তাঁহাদের ধ্যানমন্ত্রে যে-প্রকার আকৃতির উল্লেখ পাওয়া যায়, সেই সকল স্বরূপ কাঁহারা কল্পনা করিয়াছেন। এই জিজ্ঞাসার প্রয়োজনও আছে—

দেবঞ্চ যন্ত্ররূপঞ্চ মন্ত্রব্যাপ্তিমজানতাম্।
কৃতার্চনাদিকং সর্বং ব্যর্থং ভবতি শাম্ভবি ॥

—দেবতা ও যন্ত্রের স্বরূপ এবং মন্ত্রের শক্তি জানা না থাকিলে অর্চনাদি সকলই ব্যর্থ হইয়া যায়।

বরিবস্যারহস্যেও (৫৪) পাইতেছি—

নার্থজ্ঞানবিহীনং শব্দস্যোচ্চারণং ফলতি।
ভস্মনি বহ্নিবিহীনে ন প্রক্ষিপ্তং হবির্জ্বলতি ॥

—অর্থের জ্ঞান না হইলে মন্ত্রের উচ্চারণ শুধু ভস্মে ঘৃত প্রক্ষেপের সমান। তাহাতে কোন ফল হয় না।

প্রপন্নগীতা বা পাণ্ডবগীতায় ব্যাসের উক্তি বলিয়া একটি শ্লোক পাওয়া যায়—

রূপং রূপবিবর্জিতস্য ভবতো ধ্যানেন যৎ কল্পিতম্,
স্তুত্যানির্বচনীয়তাখিলগুরোর্দূরীকৃতা যন্ময়া।
ব্যাপিত্বঞ্চ বিনাশিতং ভগবতো যত্তীর্থযাত্রাদিনা,
ক্ষন্তব্যং জগদীশ তৎবিকলতাদোষত্রয়ং মৎকৃতম্॥

—হে জগদীশ, তুমি রূপরহিত। আমি ধ্যানমন্ত্র রচনা করিয়া তোমার রূপ বর্ণনা করিয়াছি। তুমি অনির্বচনীয়। আমি স্তব-স্তুতি রচনা করিয়া তোমার অনির্বচনীয়তা দূর করিয়াছি। তুমি বিভু সর্বব্যাপী। তীর্থে গেলে তোমার দর্শন মিলিবে বলিয়া তীর্থমাহাত্ম্য বর্ণনা করিয়াছি। তাহাতে তোমার সর্বব্যাপিত্ব খণ্ডিত হইয়াছে। আমার কৃত এই তিনটি বিকলতা-দোষ তুমি ক্ষমা কর—এই প্রার্থনা।

ব্যাসদেবের এই প্রার্থনা দেখিয়া অনেকে মনে করেন, সাধকগণ আপন আপন রুচি অনুসারে নিষ্কল পর-ব্রহ্মের নানাবিধ রূপের কল্পনা করিয়াছেন। কুলার্ণব-তন্ত্রের ষষ্ঠোল্লাসেও একটি বচন আছে—

চিন্ময়স্যাপ্রমেয়স্য নিষ্কলস্যাশরীরিণঃ।
সাধকানাং হিতার্থায় ব্রহ্মণো রূপকল্পনা॥

—চিন্ময় অপ্রমেয় নিষ্কল অশরীরী ব্রহ্ম সাধকগণের হিতের নিমিত্ত রূপ কল্পনা করিয়াছেন।

এই বচনকেও তাঁহাদের সিদ্ধান্তের অনুকূল বলিয়াই মনে করেন। কুলার্ণব-তন্ত্রের বচনটির যে অনুবাদ করা হইয়াছে, বিরুদ্ধবাদিগণ তাহা স্বীকার করিতে চাহেন না। তাঁহারা 'সাধকানাং' এই পদের ষষ্ঠী বিভক্তিকে কর্তৃরূপ অর্থে গ্রহণ করিয়া থাকেন। 'রূপকল্পনা' এই পদের সহিত 'সাধকানাং' পদটির অন্বয় হইতেছে বলিয়া সিদ্ধান্ত করেন। 'ব্রহ্মণঃ' এই পদের ষষ্ঠী-বিভক্তিকে তাঁহারা সম্বন্ধবোধক বলিয়া মনে করেন। তাঁহাদের এই প্রকার ব্যাখ্যায় অর্থ দাঁড়াইতেছে, সাধক-কর্তৃক ব্রহ্মের রূপ কল্পিত হইয়াছে। পাণ্ডবগীতায় ব্যাসদেবের প্রাগুক্ত ক্ষমাপ্রার্থনা বাক্যটিও এই ব্যাখ্যার অনুকূল হইতেছে।

যে-কোন সন্দিগ্ধ শাস্ত্র-বাক্যের সিদ্ধান্ত স্থির করিতে হইলে কতকগুলি বিচারপদ্ধতিকে মানিয়া লইতে হয়। সেই পদ্ধতির ভিতরে ষড়্‌বিধ লিঙ্গ অন্যতম। প্রাচীন একটি কারিকা আছে—

উপক্রমোপসংহারাবভ্যাসোঽপূর্বতা ফলম্।
অর্থবাদোপপত্তী চ লিঙ্গং তাৎপর্যনির্ণয়ে॥

যে প্রকরণে যে বস্তুটি প্রতিপাদ্য, সেই প্রকরণের আদিতে এবং অন্তে সেই বস্তুর কথনকে উপক্রমোপসংহার বলে। যে প্রকরণে যে বস্তু প্রতিপাদ্য, সেই প্রকরণের মধ্যে পুনঃ পুনঃ সেই বস্তুর প্রতিপাদনের নাম অভ্যাস। যে প্রমাণে যে বস্তু প্রতিপাদ্য, তৎপ্রমাণের অতিরিক্ত প্রমাণের অবিষয়-রূপে সেই বস্তুর প্রতিপাদনের নাম অপূর্বতা। যে প্রকরণে যে বস্তু প্রতিপাদ্য, সেই প্রকরণে সেই বস্তুর বা তদনুষ্ঠানের প্রয়োজন শ্রবণের নাম ফল। অর্থবাদ হইতেছে—প্রশংসা, আর বস্তু প্রতিপাদনের যুক্তির নাম প্রতিপত্তি। এই ছয়প্রকার প্রমাণের দ্বারা বাক্যের তাৎপর্য নির্ণয় করিতে হয়। পণ্ডিতগণ এই কথা বলিয়া থাকেন।

শাস্ত্রনিপুণ আচার্যদের ব্যাখ্যা হইতে জানা যায়, প্রাগুক্ত কুলার্ণব-তন্ত্রের বচনে সাধক শব্দের পরে যে ষষ্ঠী বিভক্তি প্রযুক্ত হইয়াছে, তাহা সম্বন্ধ মাত্রের বোধক। 'হিতার্থায়' এই পদের সহিত তাহার অন্বয় হইতেছে। 'ব্রহ্মণঃ' শব্দের উত্তর যে ষষ্ঠী বিভক্তি প্রযুক্ত হইয়াছে, তাহা কর্তৃত্বেরই বোধক এবং রূপকল্পনা পদের সহিত অন্বিত। ইহাতে এইরূপ অর্থ দাঁড়াইতেছে যে, সাধকগণের হিতের নিমিত্ত ব্রহ্ম কর্তৃক স্বীয় রূপ কল্পিত হইয়াছে। এইপ্রকার ব্যাখ্যায় শাস্ত্রীয় উপক্রম ও উপসংহারের মধ্যে কোন বিরোধ ঘটে না। এই ব্যাখ্যাই শাস্ত্রানুগ। ইহার অনুকূলে অসংখ্য শাস্ত্রবচন পাওয়া যায়। প্রসিদ্ধ কয়েকটি উদ্ধৃত হইতেছে—

উপাসকানাং কার্য্যার্থং শ্রেয়সে জগতামপি।
দানবানাং বিনাশায় ধৎসে নানাবিধাস্তনূঃ॥

... ...

সাকারাপি নিরাকারা মায়য়া বহুরূপিণী (মহানির্বাণ-তন্ত্র)

—উপাসকগণের কার্যসিদ্ধি, জগতের কল্যাণ এবং দানবগণের বিনাশের নিমিত্ত তুমি নানাবিধ শরীর গ্রহণ করিয়া থাক।

তিনি সাকারা হইয়াও নিরাকারা, অর্থাৎ শরীরধারী জীবের ন্যায় কোন বিশেষ আকৃতিতে আবদ্ধ নহেন। আপন মায়া অবলম্বনে স্বেচ্ছায় বহুবিধ রূপ ধারণ করেন।

সর্বেষামুপকারায় সাকারোঽভূন্নিরাকৃতিঃ। (অগস্ত্য-সংহিতা)

—নিরাকার পরমেশ্বর সকলের উপকারের নিমিত্ত আকৃতি গ্রহণ করিলেন। গায়ত্রী দেবীর ধ্যানে পাওয়া যায়—

স্বেচ্ছাগৃহীতবপুষীম্। (গায়ত্রী-তন্ত্র)

—তিনি স্বেচ্ছায় লীলাচ্ছলে দেহ ধারণ করিয়াছেন।

সা হি নানাবিধা ভূত্বা সাধকাভীষ্টদা ভবেৎ (পিচ্ছিলা-তন্ত্র)

—সেই দেবীই নানাবিধ রূপ ধারণ করিয়া সাধকের অভীষ্ট পূর্ণ করেন।

সাধকানাং হিতার্থায় অরূপা রূপধারিণী (নবরত্নেশ্বর)

—অরূপা হইয়াও তিনি সাধকগণের হিতের নিমিত্ত রূপ পরিগ্রহ করিয়া থাকেন।

চিতিরূপা মহামায়া পরং ব্রহ্মস্বরূপিণী।
সেবকানুগ্রহার্থায় নানারূপং দধার সা॥ (নবরত্নেশ্বর)

—চিৎস্বরূপা পরব্রহ্মরূপিণী সেই মহামায়া সেবকগণকে অনুগ্রহ করিতে নানা-রূপ ধারণ করিয়াছেন।

রূপৈরনেকৈর্বহুধাত্মমূর্তিম্
কৃত্বাঽম্বিকে তৎ প্রকরোতি কান্যা॥ (মার্কণ্ডেয় চণ্ডী)

—মাতঃ অম্বিকে। অনেক রূপ গ্রহণে আত্মমূর্তিকে বহুধা বিভক্ত করিয়া অসুরগণের বিনাশ সাধন করিয়াছ। তুমি ব্যতীত অপর কে এরূপ অনুগ্রহ করিতে পারে?

যতীনাং মন্ত্রিণাঞ্চৈব জ্ঞানিনাং যোগিনান্তথা।
ধ্যানপূজানিমিত্তং হি তনুর্গৃহ্লাতি মায়য়া॥ (সুপ্রভেদ-তন্ত্র)

—সন্ন্যাসী, মন্ত্রসাধক, জ্ঞানমার্গী ও যোগী, ইঁহাদের ধ্যান ও পূজার নিমিত্ত ব্রহ্ম মায়াকে আশ্রয় করিয়া শরীর (রূপ) গ্রহণ করিয়া থাকেন।

মহাভাগবতান্তর্গত ভগবতী-গীতায় শ্রীপার্বতী-হিমালয়-সংবাদে এইরূপ অনেকগুলি বচন আছে। আরও আছে যে, মহাশক্তিই দক্ষযজ্ঞে যাত্রার কালে দশ-মহাবিদ্যার রূপ ধারণ করিয়া শিবকে বিমোহিত করিয়াছিলেন। ভগবান্ শঙ্করাচার্য তাঁহার ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যে (১।১।২০) বলিয়াছেন—

স্যাৎ পরমেশ্বরস্যাপীচ্ছাবশান্মায়াময়ং রূপং সাধকানুগ্রহার্থম্।

—সাধককে অনুগৃহীত করিতে পরমেশ্বরও স্বেচ্ছায় মায়াময় রূপ ধারণ করেন।

শঙ্করাচার্য তাঁহার এই উক্তির অনুকূলে শাস্ত্রবচনও উদ্ধৃত করিয়াছেন। যথা—

মায়া হ্যেষা ময়া সৃষ্টা যন্মাং পশ্যসি নারদ।
সবভূতগুণৈর্যুক্তং মৈবং মাং জ্ঞাতুমর্হসি॥

—হে নারদ, তুমি যে আমাকে দেখিতে পাইতেছ, এই মায়াও আমিই সৃষ্টি করিয়াছি। তাহা না হইলে অপর প্রাণিগণের ন্যায় আমার ভৌতিক গুণবিশিষ্ট রূপ দেখিতে পাইতে না।

শাস্ত্রে এইরূপ সিদ্ধান্ত থাকায় পাণ্ডবগীতায় ব্যাসের প্রার্থনার অন্যবিধ তাৎপর্য স্থির করিতে হইবে। ব্যাসদেব অষ্টাদশ মহাপুরাণ ও অনেকগুলি উপপুরাণ রচনা করিয়াছেন। পুরাণের আখ্যায়িকা-ভাগে এরূপ অনেক কথা আছে, যে-গুলির যথাশ্রুত অর্থ গ্রহণ করা চলে না। পুরাণাদি সর্বসাধারণের পাঠ্য। আখ্যায়িকাদির তাৎপর্য নির্ণয় করা সকলের পক্ষে সম্ভবপর নহে। 'রূপং রূপবিবর্জিতস্য' ইত্যাদি শ্লোকে ব্যাসদেব বলিতেছেন—হে জগদীশ, তুমি রূপবিবর্জিত হইয়াও সাধকের হিতের নিমিত্ত রূপ পরিগ্রহ করিয়া থাক। আমি তোমার সেই সাধকানুগ্রাহক রূপেরই বর্ণনা করিয়াছি। তোমার লীলার বর্ণনাকেও দোষ বলিয়াই মনে করিতেছি। কারণ অনেকেই পুরাণাদি পাঠ করিয়া মনে করিবেন, এইসকল রূপ আমারই কল্পিত। তুমি বাক্য ও মনের অগোচর। তথাপি তোমার স্তুতি রচনা করিয়াছি। তোমার স্তুতি পাঠ করিয়া সর্বসাধারণ মনে করিবেন, তুমি বাক্যের গোচর হইয়া থাক। সুতরাং এইপ্রকার বর্ণনা করায় আমার অপরাধ হইয়াছে। তুমি সর্বব্যাপী বিভু, এই পৃথিবী কেন, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডেই তুমি বিরাজিত। আমি তীর্থমাহাত্ম্য বর্ণনা করায়

অনেকে মনে করিতে পারেন, শুধু তীর্থক্ষেত্রেই তুমি বিরাজ করিতেছ। আমার এই তিনটি অপরাধ তুমি ক্ষমা কর।

মহর্ষি বেদব্যাসের বাক্যের এইপ্রকার তাৎপর্য স্বীকার না করিলে অসংখ্য শাস্ত্রবচনের সহিত অসঙ্গতি হইয়া থাকে। সুতরাং যথাশ্রুত প্রাথমিক অর্থকে বাদ দিয়া ব্যাস-বচনের অন্যবিধ তাৎপর্য নির্ণয় করা ব্যতীত উপায় নাই।

সম্প্রতি সিদ্ধান্তবাদীদের কয়েকটি যুক্তিও প্রদর্শিত হইতেছে।

নির্গুণ ব্রহ্মের দয়া, দাক্ষিণ্য, রোষ, তোষ, মায়া, মমতা প্রভৃতি কিছুই নাই। তাঁহার দেহও নাই। তথাপি তাঁহার প্রসাদ লাভের নিমিত্ত কেন উপাসনা করিতে যাইব? ইহা তো একপ্রকার আত্মপ্রবঞ্চনা।

চিত্তকে স্থির করিবার নিমিত্ত সাধককে যদি একান্তই রূপের কল্পনা করিতে হয়, তবে শুধু নয়নমনো-বিমোহন রূপের কল্পনা না করিয়া চতুর্ভুজ, দশভুজ, নৃমুণ্ডমালিনী ইত্যাদি অস্বাভাবিক ও অদ্ভুত রূপের কল্পনা করিবার কি প্রয়োজন থাকিতে পারে?

মূর্তির কল্পনা করা যদি উপাসকের স্বেচ্ছাধীন হয়, তবে উপাসনার নিয়ম-প্রণালীও তাঁহারই ইচ্ছায় নিয়ন্ত্রিত হইবে না কেন?

মূর্তির কল্পনার বিষয়ে যদি উপাসকের স্বাধীনতা থাকে, তবে উপাসকই কেন মন্ত্রও কল্পনা করেন না?

এইসকল আপত্তির কোন যুক্তিসঙ্গত উত্তর দেওয়া সম্ভবপর নহে। অতএব সিদ্ধান্তবাদীদের ব্রহ্ম কর্তৃক রূপকল্পনা—এই ব্যাখ্যাই সমীচীন।

কুব্জিকাতন্ত্রে আছে—

সাকারমূলকং সর্বং সাকারঞ্চ প্রপশ্যতি।
অভ্যাসেন সদা দেবি নিরাকারং প্রপশ্যতি ॥

—দেবি, প্রথমতঃ সাকার ব্রহ্মেরই উপাসনা করিতে হইবে। সকল উপাসনায়ই সাকার ভাবনার প্রয়োজন আছে। সাকার উপাসনায় সিদ্ধি লাভ করিলে নির্গুণ নিরাকার ব্রহ্মের তত্ত্ব জানিতে পারা যায়।

স্থূল রূপের ধ্যান না করিয়া কেহই সূক্ষ্ম রূপে প্রবেশ করিতে পারেন না। সাধকের সাকার উপাসনা যথাশাস্ত্র সম্পূর্ণ হইলে সূক্ষ্ম রূপের আলোচনার অধিকার জন্মিবে। মহাভাগবতে এই উপদেশটি প্রদত্ত হইয়াছে—

অনভিধ্যায় রূপন্তু স্থূলং পর্বতপুঙ্গব।
অগম্যং সূক্ষ্মরূপং মে যদ্ দৃষ্ট্বা মোক্ষভাগ্ ভবেৎ ॥

পিচ্ছিলা-তন্ত্রে এবং অন্যত্রও এই শ্রেণীর উপদেশ পাওয়া যায়। ব্রহ্মসূত্রের (৩।২।৩৩) ভাষ্যে আচার্য শঙ্করও উপাসনা সম্বন্ধে এইপ্রকার উপদেশই দিয়াছেন। নির্গুণ ব্রহ্মে বুদ্ধি স্থাপন করা সম্ভবপর নহে। নির্গুণ ব্রহ্মই নাম, রূপ প্রভৃতি গুণের যোগে উপাসনার নিমিত্ত সগুণ ব্রহ্ম-রূপে উপনিষদাদিতে কীর্তিত হইয়াছেন। সর্বব্যাপী ব্রহ্মকে উপলব্ধি করিবার নিমিত্ত মূর্তিবিশেষে উপাসনা করা হয়। যথা, শালগ্রামে বিষ্ণুর উপাসনা। (ব্রহ্মসূত্রভাষ্য ১।২।১৪)

মূর্তি ও মূর্তিপূজা

দীক্ষা গ্রহণের পর সাধককে প্রত্যহই ইষ্টদেবতার পূজা করিতে হইবে। শাস্ত্রে পূজার নিত্যত্ব কীর্তিত হইয়াছে, অর্থাৎ না করিলে প্রত্যবায় হইবে। এই পূজাতে দীক্ষিত সকল নর-নারীরই সমান অধিকার। বিশ্বসার-তন্ত্রে বলা হইয়াছে—

আগমোক্তবিধানেন স্ত্রী শূদ্রৈশ্চেব পূজয়েৎ।

—স্ত্রীলোক এবং শূদ্রও এই পূজনের অধিকারী।

সাত্ত্বিকী, রাজসী, তামসী, মানসী, বচোময়ী প্রভৃতি ভেদে পূজার নানাবিধ ভেদ শাস্ত্রে কীর্তিত হইয়াছে। নিত্য পূজা ও কাম্য পূজায় প্রভেদ আছে। নিত্য পূজায় উপচারের কোন নিয়ম নাই। যথাসম্ভব সংগৃহীত উপচারে পূজার ব্যবস্থা, কিন্তু কাম্য পূজায় নির্দিষ্ট সকল দ্রব্যই সংগ্রহ করিতে হয়।

পর ব্রহ্মের লীলাচ্ছলে অনন্ত রূপের প্রকাশ, তাই অনন্ত দেবতার বর্ণনা। প্রকৃতপক্ষে সকল দেবতাই সনাতন পর ব্রহ্ম ব্যতীত পৃথক্ কিছু নহেন।

শ্রুতি বলিতেছেন,

একং সদ্ বিপ্রা বহুধা বদন্তি অগ্নিং যমং
মাতরিশ্বানমাহুঃ। (ঋগ্বেদ ১।১৪৮।৩৬)
এষ উহ্যেব সর্বে দেবাঃ। (বৃহদারণ্যকোপনিষৎ ১।৪)

—পরমেশ্বরই সকল দেবতা-রূপে প্রকাশিত।

তাঁহার স্বেচ্ছাকৃত লীলাতেই রূপের বিভিন্নতা ঘটে—এই কথা নানা শাস্ত্র-বচনের দ্বারা স্থির করা হইয়াছে। সচ্চিদানন্দের মূর্তিও সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ। সাধক মৃন্ময় মূর্তিতেও তাঁহার চিন্ময় স্বরূপেরই উপলব্ধি করিতে চেষ্টা করেন। কোন্ অশুভ মুহূর্তে প্রথমে কোন্ ব্যক্তি মূর্তিপূজা অর্থে 'পৌত্তলিকতা' শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন বলিতে পারি না। তিনি যত বড় পণ্ডিতই হউন না কেন—হিন্দুর উপাসনাপ্রণালীর কোনও গ্রন্থ পড়িবার মত বিদ্যা তাঁহার ছিল না, অথবা থাকিলেও সেই বিদ্যার চর্চা করেন নাই, ইহা অতি সত্য কথা।

যেহেতু পরমেশ্বরের লীলাতেই তাঁহার বিভিন্ন রূপের প্রকাশ, সেইহেতু তাঁহার কোন রূপকেই একমাত্র রূপ বলিয়া স্বীকার করা যায় না। তিনি অনন্তরূপ, তিনি বিশ্বরূপ, তিনি বিশ্বোত্তীর্ণ। আমরা মনে করি—নিরাকার শব্দের অর্থ আকার-বিহীন নহে। শাস্ত্রে আকার-বিহীনকে নিরাকার বলা হয় নাই, পরন্তু যাঁহার নির্দিষ্ট কোন আকার নাই, অর্থাৎ যাঁহার আকারের ইয়ত্তা করা সম্ভবপর নহে, তিনিই নিরাকার। তাঁহার আকার সম্বন্ধে এইমাত্র বুঝিতে হইবে—তাঁহার স্বরূপ নিখিলেরই স্বরূপ এবং নিখিলের অতীত। অনন্ত রূপে লীলা করিলেও তিনি সকল রূপেই নির্লিপ্ত বা অনাসক্ত।

[দ্রষ্টব্যঃ অভিনব গুপ্তের তন্ত্রালোক (৪।১১৬)
টীকা : নিরাকার ইতি নিয়তাকাররহিতে।]

মূর্তি-পরিগ্রহ তাঁহার লীলা মাত্র। স্বরূপতঃ সত্য না হইলেও আনন্দের আতিশয্যে যাহা সত্যের ন্যায় অভিনীত হয়, তাহাই লীলা। ভগবানের দৃষ্টিতে তাঁহার দেহও যেমন অভিনয়, এই সংসারও তেমনি অভিনয়। আমাদের ন্যায় সংসারাসক্ত জীব যত দিন সংসারকে অভিনয় বলিয়া ধারণা করিতে না পারি, তত দিন তাঁহার মূর্তিকেও অভিনয় বলিতে পারি না।

উপাসক পবিত্র স্থানে এবং শুদ্ধ আসনে বসিয়া তাঁহার উপাসনা করিবেন। পূজার আধার সম্বন্ধে মাতৃকাভেদ-তন্ত্র বলিতেছেন—

শালগ্রামে মণৌ যন্ত্রে প্রতিমায়াং ঘটে জলে।
পুস্তিকায়াঞ্চ গঙ্গায়াং শিবলিঙ্গে প্রসূনকে॥

দেবতাবিশেষে এইসকল আধারের বৈশিষ্ট্যের কথাও শাস্ত্রে কীর্তিত হইয়াছে।

শক্তিপূজার আধার সম্বন্ধে যোগিনী-তন্ত্রে পাওয়া যাইতেছে—

লিঙ্গস্থাং পূজয়েদ্দেবীং পুস্তকে প্রতিমাসু চ।
স্থণ্ডিলে পাদুকে চিত্রে খড়েগ বহ্নৌ জলেষু চ॥
লৌহিত্যে চৈব গঙ্গায়াং সাগরে তীর্থসঙ্গমে।
প্রতিপীঠে বিল্বমূলে বিল্ববৃক্ষে চ শঙ্করি।

* * *

দেবীং সংপূজয়েন্নিত্যং ভক্তিশ্রদ্ধাসমন্বিতঃ॥

কালী, তারা, ছিন্নমস্তা, ত্রিপুরাসুন্দরী, ভৈরবী প্রমুখ দেবীগণের পূজায় শালগ্রামকে পূজার আধার-রূপে গ্রহণ করা চলিবে না। এইভাবে আরও কতকগুলি বিধি এবং নিষেধ মায়া-তন্ত্র, মাতৃকাভেদ-তন্ত্র প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে জানা যায়।

শ্রীমদ্ভাগবতেও (১১।২৭।১২) আটপ্রকার প্রতিমার কথা পাওয়া যায়। যথা—

শৈলী দারুময়ী লৌহী লেপ্যা লেখ্যা চ সৈকতা।
মনোময়ী মণিময়ী প্রতিমাষ্টবিধা স্মৃতা॥

—পাষাণময়ী, দারুময়ী, ধাতুনির্মিতা, চন্দনসিন্দূরাদি-চিত্রিতা, চিত্ররূপা, বালুকাদি-নির্মিতা, মনোময়ী, এবং মণিময়ী—এই অষ্টমবিধ প্রতিমা।

স্থণ্ডিল (কুশণ্ডিকা বা যজ্ঞের নিমিত্ত শোধিত ভূমি), অগ্নি, সূর্য, জল এবং স্বকীয় হৃদয়ে দেবতার্চনার কথাও শ্রীমদ্ভাগবতে (১১।২৭।৯) পাওয়া যায়।

উপাসক সর্বাগ্রে মনোময়ী মূর্তিরই উপাসনা করিয়া থাকেন। এই উপাসনার নাম অন্তর্যাগ। অতঃপর অন্তর্নিহিত উদ্বুদ্ধ ব্রহ্মতেজঃ স্থূল প্রতিমায় সংক্রামিত করিয়া সাধক বাহ্যপূজা করিয়া থাকেন। মূর্তির ধ্যান করিয়া তাঁহার সমস্ত মূল তত্ত্ব প্রত্যক্ষ করিতে না পারিলে সেই মূর্তির প্রাণপ্রতিষ্ঠাই হয় না। মূল তত্ত্ব বিষয়ে জ্ঞান না জন্মিলে সেই পূজার কোনও সার্থকতা নাই। প্রতিমাতে পূজা না করিয়া যাঁহারা দেবতার যন্ত্র প্রভৃতি আধারে পূজা করেন,

তাঁহারা মনোময়ী মূর্তিরই ধ্যান করিয়া থাকেন। সাধক প্রথমতঃ মানস উপচারে তাঁহার সর্বস্বই দেবতাকে নিবেদন করেন।

শিব-মানসস্তোত্রে ভক্ত বলিতেছেন—

*　*　*

সাষ্টাঙ্গং প্রণতিঃ স্তুতির্বহুবিধা হ্যেতৎ সমস্তং ময়া।
সঙ্কল্পেন সমর্পিতং তব বিভো পূজাং গৃহাণ প্রভো॥

উচ্চ স্তরের সাধক ভাবিয়া থাকেন, সমস্ত দিন-রাত্রিতে তিনি যাহা কিছু করিতেছেন, সব কিছুই ভগবানের পূজার অঙ্গ। মানস-স্তোত্রেই দেখিতে পাই, ভক্ত বলিতেছেন,—

আত্মা ত্বং গিরিজা মতিঃ সহচরাঃ প্রাণাঃ শরীরং গৃহম্।
পূজা তে বিষয়োপভোগরচনা নিদ্রা-সমাধিস্থিতিঃ॥
সঞ্চারঃ পদয়োঃ প্রদক্ষিণবিধিঃ স্তোত্রাণি সর্বা গিরঃ।
যদ্ যৎ কর্ম্ম করোমি তত্তদখিলং শম্ভো তবারাধনম্॥

—শম্ভো! তুমিই আমার আত্মা, গিরিজা আমার মতি, আমার প্রাণ তোমার সহচর, এই দেহই তোমার মন্দির। আমার বিষয়োপভোগই তোমার পূজা, নিদ্রাই আমার সমাধির অবস্থা। বিষয়-কার্যে ভ্রমণই তোমাকে প্রদক্ষিণ করা এবং আমার উচ্চারিত সকল বাক্যই তোমার স্তুতি। আমি যে যে কাজ করিয়া থাকি, সব কিছুই তোমার আরাধনা।

উমানন্দের নিত্যোৎসবেও উক্ত হইয়াছে, সহস্রারে অধিষ্ঠিত পরমশিব বা পরমাত্মাই হৃদয়-পুণ্ডরীকে জীবাত্ম-রূপে অবস্থিত আছেন। ইন্দ্রিয় দ্বারা তিনিই যাবতীয় উপভোগ্য বিষয় উপভোগ করিয়া থাকেন। এই পরমাত্মাকে অগ্নি-রূপে কল্পনা করিতে হয়। আর তাঁহার সঙ্কুচিত স্বাতন্ত্র্য অর্থাৎ নিয়তি, সঙ্কুচিত নিত্যতা অর্থাৎ কাল, সঙ্কুচিত নিত্যতৃপ্ততা অর্থাৎ রাগ, সঙ্কুচিত নিত্যকর্তৃত্ব অর্থাৎ কলা, সঙ্কুচিত সর্বজ্ঞতা অর্থাৎ অবিদ্যা—এই পাঁচটি শক্তিকে সেই অগ্নির শিখা-রূপে কল্পনা করিতে হয়। সেই অগ্নিতে ইন্দ্রিয় রূপ স্রুক্ দ্বারা গৃহীত উপভোগ্য বিষয়-রূপ হবিঃ আহুতি প্রদান করিতে হয়। অর্থাৎ ইন্দ্রিয় দ্বারা আমরা যে-সকল বিষয় গ্রহণ করি, তাহা জীব-রূপে অবস্থিত পরমশিবে আহুতি

প্রদান মাত্র। এইপ্রকার ভাবনার ফলেই কর্মফলে অনাসক্তি আসে। কিছুই আত্মসুখের নিমিত্ত নহে—এই ভাবনায় বিষয়োপভোগও বন্ধনের হেতু না হইয়া পরম-শিবত্ব প্রাপ্তির অনুকূলই হইয়া থাকে।

ভক্তপ্রবর রামপ্রসাদও মানস পূজার অপূর্ব সঙ্গীত গাহিয়াছেন—

ওরে মন ভজ কালী, তোর ইচ্ছা হয় যে আচারে,
গুরুদত্ত সাধন-মন্ত্র দিবা-নিশি জপ করে।
শয়নে প্রণাম জ্ঞান, নিদ্রায় কর মাকে ধ্যান,
তুমি নগর ফের, মনে কর প্রদক্ষিণ শ্যামা মারে॥
যত শুন কর্ণপুটে সকলই মার মন্ত্র বটে,
সে মা পঞ্চাশ বর্ণময়ী বর্ণে বর্ণে রূপ ধরে।
কৌতুকে রামপ্রসাদ রটে—মা বিরাজে সর্ব ঘটে,
তুমি আহার কর, মনে কর আহুতি দাও শ্যামা মারে॥

বাহ্য উপচারে পূজা করিবার আগেই মানস পূজার বিধান। এই প্রকার আত্মসমর্পণ পরম ভক্ত ব্যতীত অন্যের চিন্তারও বাহিরে।

পূজা করিতে করিতে পূজ্যের গুণগ্রাম মানবচরিত্রে প্রকটিত হইয়া উঠে। তাহা না হইলে বুঝিতে হইবে, পূজকের পূজা লোক-দেখানো মাত্র। তন্ত্র-শাস্ত্র বলিতেছেন, পূর্ণ সংবিদ্-রূপ পরমাত্মার সহিত আপনার সঙ্গতি অর্থাৎ সান্নিধ্যই প্রকৃত পূজা—

পূজা নাম ন পুষ্পাদ্যৈর্যা মতিঃ ক্রিয়তে দৃঢ়া।
নির্বিকল্পে মহাব্যোম্নি সা পূজা　*　*॥

(তন্ত্রালোক-টীকাধৃত ৪।১২১)

প্রথমাধিকারীর বাহ্যপূজায় ফুল, চন্দন, নৈবেদ্য প্রভৃতি উপচারের প্রয়োজন আছে। স্থান এবং কাল সম্বন্ধে শাস্ত্রের বিধানও মানিতে হয়। কিন্তু সাধকের উন্নতাবস্থায় এইসকল বস্তুর প্রতি লক্ষ্য রাখিবার কোন প্রয়োজন হয় না। এইসকল বিধি-নিষেধ সম্বলিত অনুষ্ঠানপ্রণালী মুখ্যতঃ চিত্তশুদ্ধির হেতুরূপে আদৃত হইয়া থাকে।

বাহ্যপূজায় আসন, প্রাণায়াম, মুদ্রা, ন্যাস প্রভৃতির সমধিক উপযোগ শাস্ত্র-বিহিত। এইগুলির বিস্তৃত আলোচনার ক্ষেত্র ইহা নহে। বিশেষতঃ এই সকল যৌগিক কৌশল সম্পূর্ণরূপে গুরুগম্য। শুধু গ্রন্থ পড়িয়া অভ্যাস করিতে গেলে নানাবিধ দৈহিক ও মানসিক পীড়ার আশঙ্কা থাকে।

আসন, প্রাণায়াম ও ন্যাসের দ্বারা মন একাগ্র হয় এবং দেহ স্থির হয়। করযুগলের বিভিন্নপ্রকার ভঙ্গী (মুদ্রা) দ্বারা পূজার কি সহায়তা হয়, তাহা বলা শক্ত। রুদ্রযামলে বচন পাওয়া যায়—

মোদনাৎ সর্বদেবানাং দ্রাবণাৎ পাপসন্ততেঃ।
তস্মান্মুদ্রেতি বিখ্যাতা মুনিভিস্তন্ত্রবেদিভিঃ॥

—মুদ্রাগুলি দেবতার আমোদ বর্ধন করে এবং পূজককে পাপমুক্ত করে। এই কারণে মুদ্রা বলা হয়।

আনুষ্ঠানিক পূজাদিতে শৈব ও সৌর সাধকগণের পদ্ধতিতে অনুক্ত বিষয়ে শাক্ত পদ্ধতিকে অনুসরন করিতে হয়, আর গাণপত্য সাধকের পক্ষে বৈষ্ণব-পদ্ধতি অনুসরণের ব্যবস্থা। এই বিষয়ে ব্রহ্মবৈবর্ত-পুরাণের গণেশ-খণ্ড এবং রুদ্রযামলের ৬৬তম পটল দ্রষ্টব্য। হরতত্ত্বদীধিতিতেও পূজাপ্রকরণে এইসকল কথা বিবৃত হইয়াছে।

ভূতশুদ্ধি ও ষট্‌চক্র

উপাসনায় পাঁচপ্রকারের শুদ্ধি বিশেষভাবে করণীয়। আত্মশুদ্ধি, স্থানশুদ্ধি, মন্ত্রশুদ্ধি, দ্রব্যশুদ্ধি ও দেহশুদ্ধি না করিলে পূজা-অর্চনাদি নিস্ফল হইয়া পড়ে। এই বিষয়ে অগস্ত্য-সংহিতায় বচন পাওয়া যায়—

আত্মস্থানমনুদ্রব্যং দেহশুদ্ধিস্তু পঞ্চমীম্।
যাবন্ন কুরুতে দেবি তাবদ্দেবার্চনং ন হি॥

কুলার্ণব-তন্ত্রেও এইপ্রকার বচন পাওয়া যাইতেছে। ভূতশুদ্ধি এবং প্রাণায়ামাদি আত্মশুদ্ধির অনুকূল। কুলার্ণব-তন্ত্র বলিতেছেন,

আত্মা তু ভূতসংশুদ্ধিপ্রাণায়ামাদিভিঃ প্রিয়ে।
ষড়ঙ্গাদ্যখিলন্যাসৈর্দেহশুদ্ধিরিহোদিতা।
দেহশুদ্ধিং বিধায়েত্থং ততো বৈ স্থাপয়েদসূন্॥

—ভূতশুদ্ধি, প্রাণায়াম প্রভৃতি দ্বারা আত্মশুদ্ধি হইয়া থাকে। অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞানের আবরক মলের অপস্থৃতি ঘটে। করন্যাস, অঙ্গন্যাস প্রভৃতি দেহশুদ্ধির হেতু। দেহশুদ্ধির পরে সাধক নিজের অভিনব বিশুদ্ধ প্রাণকে প্রতিষ্ঠিত করিবেন।

ভূতশুদ্ধি শব্দের নানাবিধ অর্থ আগম-শাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায়। গুপ্তসাধন-তন্ত্রে আছে—

বামকুক্ষৌ স্থিতং পাপপুরুষং কজ্জলপ্রভম্।
তস্য সন্দহনার্থায় মহতী প্রকটীকৃতা॥

—সাধক চিন্তা করিবেন, ভূতশুদ্ধি দ্বারা তাঁহার যাবতীয় দুরিত বিনষ্ট হইয়া যাইতেছে। পাঞ্চভৌতিক দেহের পরিশুদ্ধি দ্বারাই এই পাপ বিনাশ হয় বলিয়া প্রক্রিয়াটির নাম 'ভূতশুদ্ধি'। গৌতমীয়-তন্ত্রে দেখিতে পাই—

শরীরাকারভূতানাং ভূতানাং যদ্বিশোধনম্।
অব্যয়ব্রহ্মসংযোগাদ্ ভূতশুদ্ধিরিয়ং মতা॥

অগস্ত্য-সংহিতাতেও পাওয়া যাইতেছে—

ভূতানি নাম পৃথিবী জলং তেজো মরুদ্ বিয়ৎ।
যদ্ যতো জায়তে তস্মিন্ প্রলয়োৎপাদনং পুনঃ॥
শরীরকোষভূতানাং ভূতানাং শোধনং বিদুঃ॥

সকল বচন হইতেই বোঝা যাইতেছে, লিঙ্গ-শরীর বা সূক্ষ্ম শরীরকে নির্মল করাই ভূতশুদ্ধির উদ্দেশ্য। কিন্তু স্থূল শরীরের নির্মলতার দ্বারাই লিঙ্গ-শরীরকে শোধন করিতে হয়। লিঙ্গ-শরীর বা সূক্ষ্ম শরীর সপ্তদশ অবয়ব-বিশিষ্ট। চক্ষুরাদি পঞ্চ-জ্ঞানেন্দ্রিয়, বাগাদি পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়, প্রাণাদি পঞ্চ বায়ু, মন ও বুদ্ধি—ইহাদিগকে লিঙ্গ-শরীরের অবয়ব বলা হয়।

ভূতশুদ্ধি-তন্ত্রের ষষ্ঠ পটলে অন্যবিধ সূক্ষ্ম শরীরের কথাও পাওয়া যায়—

শরীরং দ্বিবিধং দেবি স্থূলং সূক্ষ্মং শুচিস্মিতে ॥
.... সূক্ষ্মঞ্চ কথয়ামি তে ॥
ইড়া বামে স্থিতা নাড়ী শুক্লা তু চন্দ্ররূপিণী।
দক্ষিণে পিঙ্গলা নাম্নী পুংরূপা সূর্যবিগ্রহা।
তন্মধ্যে পরমেশানি সুষুম্না ব্রহ্মরূপিণী ॥ ইত্যাদি।

তান্ত্রিক উপাসনায় ভূতশুদ্ধি একটি বিশেষ স্থান অধিকার করিয়া আছে। পূজার প্রথম দিকেই সাধককে ভূতশুদ্ধি করিতে হয়। শাস্ত্রে এই প্রক্রিয়ার নিত্যত্ব কীর্তিত হইয়াছে। অগস্ত্য-সংহিতায় আছে—

ভূতশুদ্ধি-বিহীনেন কৃতা পূজাভিচারবৎ।
বিপরীতফলং দদ্যাদভক্ত্যা পূজনং যথা ॥

—ভূতশুদ্ধি না করিয়া পূজা করিলে ভক্তিহীন পূজার ন্যায় সেই পূজা হইতে কোন ফল পাওয়া যায় না, অধিকন্তু অভিচার কর্মের ন্যায় সেই পূজা বিপরীত ফল দিয়া থাকে।

ভূতশুদ্ধির স্বরূপ জানিতে হইলেই দেহস্থিত ষট্চক্রের জ্ঞান প্রয়োজন। ষট্চক্রভেদ তান্ত্রিক সাধনার মূল-তত্ত্ব। শুধু তান্ত্রিক সাধনায়ই বা কেন, সকল প্রকারের সাধনাতেই এইপ্রকারের ইঙ্গিত আছে। ছান্দোগ্য-উপনিষদেও হৃদয়ের মূল হইতে উত্থিত একাধিক শত নাড়ীর (শিরা) এবং তন্মধ্যে মস্তকভেদকারী সুষুম্নার বিবরণ পাওয়া যায়। (৮।৬।৬)

প্রশ্নোপনিষৎ (১।৮) এবং অন্যান্য উপনিষদেও এই তত্ত্বের সূচনা দেখিতে পাওয়া যায়। মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান, মণিপুরক, অনাহত, বিশুদ্ধ এবং আজ্ঞা—এই ছয়টি চক্র।

ভ্রূ-দ্বয়ের মধ্য হইতে আরম্ভ করিয়া মেরুদণ্ডের নিম্নসীমা পর্যন্ত ছয়টি সূক্ষ্ম নাড়ীচক্র আছে। সাধারণতঃ তিনটি নাড়ীর ভিতর দিয়া প্রাণবায়ু প্রবাহিত হয়। ইহাদের নাম ইড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্না। ইড়ার অপর নাম চন্দ্র এবং পিঙ্গলার অপর নাম সূর্য নাড়ী। মেরুদণ্ডে মালার ন্যায় গ্রথিত অস্থিখণ্ডগুলির নিম্নদেশ হইতে উপর পর্যন্ত সুষুম্নার অবস্থিতি। এই সুষুম্নার অনেক নাম তন্ত্রে

পাওয়া যায়। শূন্যপদবী, ব্রহ্মরন্ধ্র, মহাপথ, শ্মশান, শাম্ভবী প্রভৃতি সুষুম্নার নামান্তর।

ইড়াতে শ্বাস প্রবাহিত হইবার সময় বাম নাসাপুট দিয়া এবং পিঙ্গলাতে প্রবাহিত হইবার সময় দক্ষিণ নাসাপুট দিয়া বায়ু প্রবেশ করে ও নির্গত হয়। এক নাসাপুট হইতে অপর নাসাপুটে নিঃশ্বাসের স্রোত পরিবর্তনের সময় সুষুম্নার ভিতরে অল্পকালের নিমিত্ত বায়ু প্রবেশ করে। সাধনার ফলে সুষুম্নার পথ পরিষ্কৃত হইয়া খুলিয়া যায়। তখন তদ্দ্বারা বায়ু প্রবাহিত হইয়া অন্তঃস্থিত শক্তিকে জাগ্রত করে।

গুহ্য দেশের দুই অঙ্গুলি উপরে মেরুদণ্ডের নিম্ন সীমায় মূলাধার-চক্র অবস্থিত। সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে সকল চক্রই পদ্মফুলের আকৃতি-বিশিষ্ট। সাধকগণ এই কথা বলিয়া গিয়াছেন।

মূলাধার-চক্র চতুর্দল। দলের বর্ণ লোহিত। কর্ণিকায় স্বয়ম্ভূ লিঙ্গকে বেষ্টন করিয়া জ্ঞানরূপা আদ্যাশক্তি কুলকুণ্ডলিনী অধোমুখে বিরাজমানা।

মূলাধারচক্রে যে শক্তি (কুণ্ডলিনী) বিরাজিতা, তাঁহার স্বরূপ সম্বন্ধে শাক্তক্রমাদিতে পাইতেছি—

তড়িৎকোটিপ্রভাং সূক্ষ্মাং বিসতন্তুতনীয়সীম্।
প্রসুপ্তভুজগাকারাং সার্ধত্রিবলয়ান্বিতাম্ ॥

—কোটি কোটি তড়িতের প্রভার মত তাঁহার কান্তি, তিনি মৃণালতন্তুর ন্যায় অতি সূক্ষ্ম এবং সাড়ে তিন বেষ্টনে কুণ্ডলীভাবে অবস্থিত নিদ্রিত সাপের মত।

সহস্রারস্থিত পরম-শিবের সহিত এই শক্তির মিলন ঘটাইতে পারিলেই সাধক আনন্দময়-স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হন—

ভেদয়িত্বা সহস্রারে পরশম্ভৌ সমর্পয়েৎ। ইত্যাদি। (শাক্তক্রম)

এই শক্তির অধোমুখে অবস্থিতি মানুষের তামসিকতার লক্ষণ। সাধারণতঃ শক্তি নিদ্রিতা থাকেন। যোগিগণ এই শক্তির কুণ্ডলীভাব মোচন করিয়া ইঁহাকে ঊর্ধ্বমুখী করেন এবং সর্বোপরিস্থিত সহস্রারের সহস্রদল পদ্মে পরম-শিবের সহিত সম্মিলিত করেন। এই কারণেই ইঁহাকে 'যোগিবল্লভা' বলা হয়।

কুণ্ডলিনী শক্তির আধার এবং সুষুম্না নাড়ীর মূল বলিয়া চক্রের নাম মূলাধার।

মূলাধারের উপরিস্থিত চক্রের নাম স্বাধিষ্ঠান। উপস্থমূলের বিপরীত দিকে মেরুদণ্ডে ইহার অবস্থান। এই পদ্মটি ষড়্দল। দলের বর্ণ পাটল।

মণিপুরক বা মণিপদ্মচক্র নাভিদেশের বিপরীত দিকে মেরুমধ্যে অবস্থিত। চক্রটি দশ-দল। দলের বর্ণ নীল।

হৃৎপিণ্ডের বিপরীত দিকে মেরুমধ্যে অনাহত চক্রের স্থান। চক্রটি দ্বাদশ-দল পদ্মের আকার। দলের বর্ণ লাল।

কণ্ঠের বিপরীত দিকে মেরুমধ্যে বিশুদ্ধচক্র অবস্থিত। চক্রটি ষোড়শ-দল। দলের বর্ণ ধূসর।

আজ্ঞাচক্র ভ্রূমধ্যে অর্থাৎ মেরুদণ্ডের শেষ সীমায় অবস্থিত। পদ্মটি দ্বিদল। দলের বর্ণ শ্বেত।

আজ্ঞাচক্রের উপরে সহস্রারে সহস্রদল পদ্ম অবস্থিত।

ষট্চক্র সম্বন্ধে তন্ত্রসমূহে নানাপ্রকার বর্ণনা পাওয়া যায়। এইগুলি একমাত্র সাধনার দ্বারাই প্রত্যক্ষগোচর হইয়া থাকে। সাধনার প্রণালী সম্পূর্ণরূপে গুরুগম্য। নাড়ী-জ্ঞানী বৈদ্য যেরূপ বিরল, ভূতশোধক উপাসকও সেইরূপ বিরল। কিন্তু বিরল হইলেও শাক্ত, শৈব, বৈষ্ণব-প্রমুখ সকল সম্প্রদায়ের ভিতরেই এই শ্রেণীর সাধক আছেন। অনেকেই তাঁহাদের শক্তি প্রকাশ করেন না। বিশেষ পরীক্ষিত শ্রদ্ধালু শিষ্য ব্যতীত অপর কাহাকেও সাধকগণ এই বিদ্যা প্রদানও করেন না।

এইপ্রকার ভূতশুদ্ধিতে অসমর্থ হইলে সংক্ষিপ্ত অন্যপ্রকার ভূতশুদ্ধির ব্যবস্থাও শাস্ত্রে পাওয়া যায়। ভূতশুদ্ধি-তন্ত্রে উক্ত হইয়াছে—প্রণবযুক্ত জ্যোতির্মন্ত্র (ওঁ হ্রৌং) একশত আটবার জপ করিলেই সংক্ষেপতঃ ভূতশুদ্ধি হইয়া থাকে।

জ্যোতির্মন্ত্রং মহেশানি অষ্টোত্তরশতং জপেৎ।

* * *

এতজ্জ্ঞানপ্রভাবেন ভূতশুদ্ধেঃ ফলং লভেৎ ॥

আগমতত্ত্ববিলাস প্রভৃতি তন্ত্রে অন্যপ্রকার মন্ত্র জপের কথাও পাওয়া যায়।

কুণ্ডলিনীই জীবশক্তি। এই শক্তির জাগরণ ব্যতীত কোনও সাধনা চলিতে পারে না। জীব পরম শিবের অংশ মাত্র। জীব পরম শিব হইতে চৈতন্য এবং কুণ্ডলিনী হইতে শক্তি লাভ করিয়া থাকেন। নিদ্রিতা কুণ্ডলিনীকে প্রবুদ্ধ করিতে না পারিলে সাধনা-মাত্রই ভস্মে ঘৃতাহুতির তুল্য। সাধনার দ্বারা কুণ্ডলিনী প্রবুদ্ধ হইয়া জীবে শক্তি সঞ্চার করেন। মূলাধার হইতে সুষুম্নামার্গে কুণ্ডলিনীর উত্থিতি ও সহস্রারে পরম শিবের সহিত সামরস্যই (মিলন) সাধনার চরম অবস্থা। দীর্ঘ কালের সাধনায় এই সামরস্যই স্থায়িত্ব প্রাপ্ত হয়। সেই অবস্থায় জগৎ এবং জীবাত্মার স্বতন্ত্র অস্তিত্বই থাকে না। সমস্তই শিবময় হইয়া যায়। ইহাই সাধনার ফল বা পরাকাষ্ঠা। এই অপরোক্ষ অনুভবের পর আর কোন সাধনভূমি নাই। এই সাধনপ্রণালী একান্তভাবে গুরুগম্য।

সাধকগণ যে মাতৃকা-ন্যাসাদি অনুষ্ঠান করেন, তাহাতে জানা যায়, দেহ-মধ্যেই তাঁহারা পঞ্চাশটি বর্ণ বা মাতৃকার স্থান স্থির করিয়াছেন। কামধেনু-তন্ত্রে বর্ণতত্ত্ব বিবৃত হইয়াছে। প্রত্যেক বর্ণের আকৃতি, অধিষ্ঠাত্রী দেবতা প্রভৃতির বিবরণও সেখান হইতেই জানা যায়।

ভাব ও আচার

তান্ত্রিক উপাসনায় পশুভাব, বীরভাব এবং দিব্যভাব নামে তিনপ্রকার ভাবের কথা জানা যায়। আবার সাতপ্রকার আচারের উল্লেখও দেখিতে পাওয়া যায়। যথা—বেদ, বৈষ্ণব, শৈব, দক্ষিণ, বাম (মতান্তরে বামা), সিদ্ধান্ত ও কৌল।

ভাব শব্দের অর্থ মানসিক অবস্থা এবং আচার শব্দের অর্থ অনুষ্ঠান বা বাহ্যিক আচরণ।

যে সাধকের অবিদ্যার আবরণ একটুও শিথিল হয় নাই, যাঁহার অন্তর অবিদ্যায় একান্তই পরিপূর্ণ, তাহাকে বলা হয়—'পশু'। পশুকে দড়ি দিয়া

বাঁধিয়া রাখা হয়, জীবও অবিদ্যা-রজ্জুতে বদ্ধ। এই কারণে ভাবসাম্যে তাহাকে 'পশু' বলা হয়। এই শ্রেণীর সাধকের মানসিক অবস্থার নামই পশুভাব। সংসার-মোহে সম্পূর্ণ আচ্ছন্ন শিশ্নোদর-পরায়ণ মানব অধম পশু, আর সংযতেন্দ্রিয় শাস্ত্রবিশ্বাসী তত্ত্বজিজ্ঞাসু মানব উত্তম পশু—এইমাত্র উভয়ের প্রভেদ।

যে সাধক অবিদ্যা-রূপ রজ্জুকে ছেদন করিয়া পূর্ণোদ্যমে বীরের মত ঈশ্বর দর্শনের নিমিত্ত যাত্রা করিয়াছেন, তিনিই বীর। তাঁহার মানস অবস্থাকে বীরভাব বলে। এই অবস্থা ঘটিলে সাধকের অজ্ঞানান্ধকার কিঞ্চিৎ অপসারিত হয়, ঈশ্বরের সহিত যোগও সামান্য মাত্রায় ঘটে, কিন্তু তাঁহার সেই যোগ স্থায়ী হয় না। সেই সময় তিনি জগতের সমস্ত কিছুকেই শিব-শক্তির লীলা বলিয়া ক্রমে ক্রমে অনুভব করিতে পারেন।

বীরভাবের সাধনার মধ্য দিয়াই সাধক দিব্যভাবে উন্নীত হইতে পারেন। উপাস্য দেবতার সহিত সাধক যখন আপনার অভিন্নতা অনুভব করিয়া আনন্দে মগ্ন হন, তখনই তিনি দেবত্ব লাভ করেন। এইহেতু সেই সাধকের নাম দিব্য-সাধক এবং তাঁহার অবস্থার নাম দিব্যভাব।

১. বেদাচার—বেদ এবং বেদমূলক স্মৃতি-পুরাণাদির অনুশাসনকে প্রমাণ-রূপে গ্রহণ করিয়া তদনুসারে উপাস্য দেবতার পূজা অর্চা করিতে হয়। প্রাতঃস্নানের পর পূর্বাহ্ণেই দেবতা-পূজার বিধান। চতুর্দশী, অষ্টমী, অমাবস্যা, পূর্ণিমা এবং সংক্রান্তি এই পাঁচটি পর্বে মাছ-মাংস খাইতে নাই। বেদ ও স্মৃতির বিধি-নিষেধ মানিয়া চলিতে হইবে। গার্হস্থ্য-ব্রহ্মচর্য পালনীয়।

২. বৈষ্ণবাচার—এই আচারও অনেকাংশে বেদাচারের ন্যায়। অষ্টাঙ্গ মৈথুনই সম্পূর্ণরূপে বর্জন করিতে হইবে। রাত্রিতে পূজা করিবে না এবং জপের মালা স্পর্শও করিবে না। বিষ্ণু-রূপকেই ভজনা করিবে এবং বিষ্ণুকেই ইষ্টদেবতা বলিয়া জানিবে। তপস্যার কষ্টকে গ্রাহ্য করিতে নাই। জগৎকে বিষ্ণুময় কল্পনা করিবে। এই আচার বেদাচার হইতে প্রশস্ত।

৩. শৈবাচার—এই আচারেও বেদাচারের কিছু কিছু পাওয়া যায়। অবৈধ পশুহিংসা বর্জন করিবে। সকল কাজে মহেশ্বরকে স্মরণ করিবে। যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি—এই অষ্টাঙ্গ যোগ অবলম্বন-পূর্বক অভীষ্ট দেবতার আরাধনা করিবে। বেদাচার এবং বৈষ্ণবাচার

অপেক্ষা শৈবাচারে শীঘ্র সিদ্ধি লাভ করা যায়। এই কারণে পূর্বোক্ত উভয় আচার হইতেই এই আচার প্রশস্ত।

৪. দক্ষিণাচার—এই আচারও অনেকাংশে বেদাচারের মত। উপাসনা বেদাচারের ন্যায়। রাত্রিতে ভাঙ্, সিদ্ধি প্রভৃতি সেবন করিয়া একাগ্রচিত্তে মন্ত্র জপ করিতে হয়। চতুষ্পথ, শ্মশান, নদীতট, শক্তিক্ষেত্র, বিল্বমূল, শিবালয় প্রভৃতি সাধনার ক্ষেত্র। মহাশঙ্খের মালাতে জপ করিতে হয়। আপন আপন বর্ণাশ্রম-ধর্ম পালন করিয়া সর্বদা আপনাকে দেবী-রূপে চিন্তা করিবে। 'দেবী ভূত্বা দেবীং যজেৎ'।

এই আচার পর্যন্তই পশুভাবের সাধনা শেষ হইয়া যায়। অতঃপর দিব্য এবং বীরভাবের সাধনার কথা। সুতরাং এই আচারই দিব্য ও বীরভাবের প্রবর্তক বলা যাইতে পারে। বিশ্বসার-তন্ত্রে বলা হইয়াছে, দক্ষিণামূর্তি ঋষি এই আচারকে প্রথমতঃ গ্রহণ করিয়াছিলেন—এই কারণে ইহার নাম দক্ষিণাচার।

দক্ষিণামূর্তিঋষিণানুষ্ঠিতোঽসৌ মতঃ প্রিয়ে।
অতএব মহেশানি দক্ষিণাচার উচ্যতে ॥

এই ব্যাখ্যাই দক্ষিণাচার শব্দের একমাত্র ব্যাখ্যা নহে। আচার্য ভাস্কর রায় সৌভাগ্যভাস্করে (১৮৩ পৃ) 'সব্যাপসব্যমার্গস্থা' এই ললিতা-নামের ব্যাখ্যায় বাম-মার্গের বিপরীত মার্গকেই দক্ষিণ-মার্গ বলিয়াছেন। বাড়বানলীয়-তন্ত্রেও পাওয়া যাইতেছে—...বামঃ স্যাদ্দক্ষিণস্তদ্বিপর্যয়াৎ। দক্ষিণামূর্তি-ঋষি কর্তৃক অনুষ্ঠিত—এইপ্রকার অর্থ অপেক্ষা বাম-মার্গের বিপরীত—এই অর্থটিই বেশী ভাল লাগে।

৫. বামাচার—দিনের বেলা ব্রহ্মচর্য অবলম্বন করিয়া উপাসনা করিতে হয়। রাত্রিতে ভোজনান্তে পঞ্চ মকারের যোগে দেবীর অর্চনার ব্যবস্থা। বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ড বাদ দিয়া তন্ত্র-বিহিত শ্রাদ্ধ, তর্পণ প্রভৃতি করিতে হইবে। বাড়বানলীয়-তন্ত্রে পাওয়া যাইতেছে—

যোগাৎ পঞ্চ মকারাণাং বামহস্তেন পূজনাৎ।
জপাদ্ধোমাচ্চ বামঃ স্যাদ্দক্ষিণস্তদ্বিপর্যয়াৎ ॥

—বামাচারের সাধনা পঞ্চ মকারের যোগে করণীয় এবং বাম হস্তে দেবতার পূজন প্রশস্ত।

মেরু-তন্ত্রে পাঁচপ্রকার বামমার্গের উল্লেখ রহিয়াছে—

কৌলিকোঽঙ্গুষ্ঠতাং প্রাপ্তো বামঃ স্যাত্তর্জ্জনীসমঃ।
চীনক্রমো মধ্যমঃ স্যাৎ সিদ্ধান্তীয়োঽবরো ভবেৎ।
কনিষ্ঠঃ শাবরো মার্গ ইতি বামস্তু পঞ্চধা ॥

—কৌলিক, বাম, চীনক্রম, সিদ্ধান্তীয় ও শাবর—বামমার্গ পাঁচপ্রকার।

বামা অর্থাৎ শক্তিরূপে আপনাকে কল্পনা করিয়া উপাসনা করিতে হয় বলিয়া এই আচারকে বামাচার (বামা+আচার) বলে—এইপ্রকার উল্লেখও পাওয়া যায়। কিন্তু বাম+আচার=বামাচার—এইরকম ব্যাখ্যাই যেন সমধিক যুক্তিসঙ্গত। কারণ বামাচারের বিপরীত আচারেরই নাম হইতেছে—দক্ষিণাচার। বাড়বানলীয়-তন্ত্রেই দেখিতে পাই—

পূর্বাম্নায়ে দক্ষমার্গো বামঃ স্যাৎ পশ্চিমে পরে।
দক্ষিণোত্তরয়োরূর্দ্ধ্বে মার্গৌ তৌ বামদক্ষিণৌ ॥

দক্ষিণের বিপরীত-রূপে বামশব্দের প্রয়োগই সমীচীন বলিয়া মনে হয়।

পাঁচপ্রকার বামাচারের মধ্যে যে চীনাচারের কথা বলা হইয়াছে, তাহা দেবতাবিশেষের উপাসনায় বিহিত। ভৈরব-তন্ত্র বলিতেছেন,

মহাচীনক্রমেণৈব তারা শীঘ্রফলপ্রদা।
*　　　*　　　*
মহাচীনক্রমেণৈব ছিন্নমস্তাবিধির্মতঃ ॥

—তারাদেবী ও ছিন্নমস্তা-দেবীর পূজায় চীনাচার (মহাচীনাচার) শীঘ্র ফল প্রদানে সমর্থ। মহর্ষি বশিষ্ঠের চীনদেশে গমন ও চীনাচারে তারা-বিদ্যার উপাসনায় সিদ্ধি লাভের কথা তারা-তন্ত্রাদিতে উল্লিখিত আছে।

স্বচ্ছন্দভৈরব-তন্ত্রে বলা হইয়াছে, চীনাচারের সাধনায় কোনপ্রকার বিধি-নিষেধ মানিতে হয় না। সাধক যথেচ্ছভাবে বিচরণ করিবেন। শ্রুতি-স্মৃতি-বিহিত শৌচাচারাদিরও তাহাতে প্রয়োজন নাই। যথা—

ন শৌচাদিক্রিয়াঃ কার্যাঃ স্মৃতিশাস্ত্রপ্রচোদিতাঃ।
স্বেচ্ছাচারোঽত্র কথিতঃ প্রচারেদ্ হৃষ্টমানসঃ ॥

৬. সিদ্ধান্তাচার—এই আচারের ক্রিয়াকলাপ অনেকাংশে বামাচারের মত। প্রধান-রূপে অন্তর্যাগকে গ্রহণ করিতে হইবে। অন্তর্যাগের অঙ্গরূপে বহির্যাগের আচরণ বিধেয়। মন্ত্র-বিশোধিত পঞ্চ মকার সেবনীয়। এই আচারে প্রকাশ্যভাবে পঞ্চ তত্ত্ব সাধনাতেও কোন ক্ষতি নাই। পশুহিংসাতেও দোষ নাই। রুদ্রাক্ষ ও অস্থির মালা ধারণ করিয়া এবং কপালপাত্র হাতে লইয়া সাধক সাক্ষাৎ ভৈরবের ন্যায় চলাফেরা করিবেন। কিছুতেই শঙ্কা করিবেন না। বামমার্গ হইতেও এই আচার প্রশস্ত। কুলার্ণব-তন্ত্র বলিতেছেন—

শঙ্কাত্যাগাদ্ ব্যক্তভাবাত্তথৈব সত্যসেবনাৎ।
বামাদপি কুলেশানি সিদ্ধান্তঃ পরমঃ স্মৃতঃ ॥

৭. কৌলাচার—কৌলজ্ঞান লাভ করিলে সাধক সদাশিবতুল্য হইতে পারেন। এই আচার-বিহিত উপাসনায় দিক্, কাল, আসন প্রভৃতির কোন নিয়ম নাই। কর্দমে চন্দনে, পুত্রে শত্রুতে, শ্মশানে এবং গৃহে কৌলের কোন ভেদ-জ্ঞান থাকে না। কৌল সাধক মহাজ্ঞানী।

উত্তম, মধ্যম ও অধম এই তিনপ্রকার কৌল আছেন। যিনি সর্বভূতে আপনার বিভু-স্বরূপ দর্শন করেন এবং আপনার মধ্যে সর্বভূতকে দর্শন করেন, তিনিই কৌলিকোত্তম। যিনি ধ্যানপর জ্ঞাননিষ্ঠ এবং সমাহিত, যিনি পঞ্চ তত্ত্ব দ্বারা সাধনা করিয়া থাকেন, তিনি মধ্যম কৌল। যিনি মাত্র জ্ঞানভূমিতে আরোহণ করিতেছেন, তিনিই প্রাকৃত (অধম) কৌল।

কুলার্ণব-তন্ত্র ও বিশ্বসার-তন্ত্রে এই সপ্তবিধ আচারের বিস্তৃত বর্ণনা পাওয়া যায়। প্রাগুক্ত সাতটি আচারের মধ্যে বেদাচার, বৈষ্ণবাচার এবং দক্ষিণাচার পশুভাবে অবলম্বনীয়। বামাচার ও সিদ্ধান্তাচার বীরভাবে, আর দিব্যভাবে শুধু কৌলাচার অবলম্বনীয়।

বিশ্বসার-তন্ত্র হইতে আরও জানা যায় যে, সাতটি আচারকেও প্রধানতঃ বামাচার ও দক্ষিণাচার—এই দুইটি ভাগের অন্তর্ভুক্ত করা যাইতে পারে। পঞ্চ তত্ত্বাদি-যুক্ত আচারের নাম বামাচার, আর পঞ্চতত্ত্বহীন আচারের নাম দক্ষিণাচার।

এই মতে বেদ, বৈষ্ণব, শৈব ও দক্ষিণ—এই চারিটি আচারকেই দক্ষিণাচার বলা হইয়াছে এবং বাম, সিদ্ধান্ত ও কৌল এই তিনটি আচারকে বামাচারের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে।

আচারো দ্বিবিধো দেবি বাম-দক্ষিণভেদতঃ।
পঞ্চমুদ্রাদিসংযুক্তো বামাচারঃ প্রকীর্তিতঃ।
পঞ্চমুদ্রাদিরহিতো দক্ষিণাচারসংজ্ঞকঃ।

আচার-প্রসঙ্গে আরও কয়েকটি কথা মনে রাখা আবশ্যক। সাধনার প্রথম দিকে সকল দ্বিজকেই বেদাচার গ্রহণ করিতে হয়। বৈষ্ণবগণ বৈষ্ণবাচারে এবং শৈবগণ শৈবাচারেই সিদ্ধি প্রাপ্ত হইবেন। সৌর ও গাণপত্য সাধকগণও বৈষ্ণবাচারেই সিদ্ধি লাভ করিবেন। শুধু উপাসনায় স্ব স্ব ইষ্টদেবতার শরণ লইতে হইবে। পরন্তু একমাত্র শাক্ত সাধকই দক্ষিণাচার, বামাচার, সিদ্ধান্তাচার ও কৌলাচারের অধিকারী। কৌলমার্গীয় সাধকের জাতিবিচার নাই। জাতিবর্ণ-নির্বিশেষে সকল শাক্তই সাধনার উচ্চাবস্থায় এই আচার গ্রহণ করিতে পারেন। কৌলাচারই চরম ভূমিকা। কুলার্ণব-তন্ত্র বলিতেছেন—

কৌলাৎ পরতরং ন হি।

মুখ্য কৌলাচার শুধু শ্রীবিদ্যা বিষয়েই উপদিষ্ট হইয়াছে। কালী, তারা প্রমুখ দেবতার কৌলাচারে পরস্পর একটু পার্থক্য আছে। দেবতাভেদে কৌলাচারের নামও পৃথক্ পৃথক্। তারা-দেবীর উপাসনায় যে কৌলাচার বিহিত হইয়াছে, তাহার নাম চীনাচার বা মহাচীনাচার। পুরশ্চর্যার্ণব গ্রন্থে এইসকল বিষয়ে বিস্তৃত বিবরণ দেখিতে পাওয়া যায়।

প্রসঙ্গতঃ কুল ও অকুল শব্দের অর্থ পর্যালোচনা করা যাইতেছে। ভবিষ্যপুরাণে আছে—

ন কুলং কুলমিত্যাহুরাচারঃ কুলমুচ্যতে।

সৌভাগ্যভাস্করে দেখিতে পাই—

পরমশিবাদিস্বগুরুপর্যন্তো বংশো বা কুলম্।

—মুমুক্ষু সাধক পরম্পরাগত যে আচারকে অবলম্বন করিয়া সাধনা করিয়া থাকেন, তাহাই কুলাচার।

সৌভাগ্যভাস্করেই অন্যত্র বলা হইয়াছে—

কুঃ পৃথ্বীতত্ত্বং লীয়তে যত্র তৎ কুলম্ আধারচক্রম্,
তৎসম্বন্ধাল্লক্ষণয়া সুষুম্নামার্গোঽপি। অতঃ সহস্রারাৎ
স্রবদমৃতং কুলামৃতম্।

—কু শব্দের অর্থ পৃথ্বী। পৃথ্বীতত্ত্ব যাহাতে লীন হয় তাহার নাম কুল। মূলাধার-চক্রে পৃথ্বীতত্ত্ব অবস্থিত। এইহেতু এই চক্রকেও কুল বলা যাইতে পারে। মূলাধারের সহিত সুষুম্না-নাড়ীর সম্বন্ধ আছে, এই কারণে লক্ষণার দ্বারা কুল-শব্দ সুষুম্নারও বোধক হইতে পারে। সুষুম্না সহস্রারে মিলিত হইয়াছে, এইহেতু সহস্রার হইতে প্রচ্যুত অমৃতের নাম কুলামৃত। ভাস্কর রায় তন্ত্রের একটি বচন উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন, কুল শব্দের অর্থ 'শক্তি' এবং অকুল শব্দের অর্থ 'শিব'। কুলেতে অকুলের সম্বন্ধ—অর্থাৎ শিবশক্তি-সামরস্যের নামই কৌল।

কুলং শক্তিরিতি প্রোক্তমকুলং শিব উচ্যতে।
কুলেঽকুলস্য সম্বন্ধঃ কৌলমিত্যভিধীয়তে।

কুলার্ণবেও পাওয়া যায়—

অকুলং শিব ইত্যুক্তং কুলং শক্তিঃ প্রকীর্তিতা।
কুলাকুলানুসন্ধানে নিপুণাঃ কৌলিকাঃ প্রিয়ে॥

এই বচন হইতে জানা যাইতেছে, শিব-শক্তির সামরস্যের অনুসন্ধাতা সাধকই কৌল।

কুলজ্ঞানের প্রতিপাদক শাস্ত্রকেও কুল-শাস্ত্র বলা হয়। পরশুরাম-কল্পসূত্রে আছে—

কুলপুস্তকানি চ গোপয়েৎ। (৬।৩৯)

অন্যত্রও (ভাস্কর রায়-কৃত) পাওয়া যায়—

দর্শনানি চ সর্বাণি কুলমেব বিশন্তি হি।

কুলসাধনের উপযোগী পদার্থগুলির সংজ্ঞাও 'কুল'। যথা—কুলবৃক্ষ, কুলশক্তি, কুলপীঠ, কুলতিথি, কুলবার, কুলাচার ইত্যাদি।

পঞ্চ তত্ত্ব বা মকার

বামাচার, সিদ্ধান্তাচার এবং কৌলাচারে বাহ্য পূজায় উপাসনার অঙ্গরূপে পঞ্চ তত্ত্বের কথা উপদিষ্ট হইয়াছে।

মদ্যং মাংসঞ্চ মৎস্যঞ্চ মুদ্রা মৈথুনমেব চ।
মকারপঞ্চকং দেবি দেবতাপ্রীতিকারকম্॥ (কুলার্ণব-তন্ত্র)

—মদ্য, মাংস, মৎস্য, মুদ্রা ও মৈথুন—এই পাঁচটি বস্তুর নামের আদিতে 'ম' অক্ষরটি থাকায় ইহাদের সংক্ষিপ্ত নাম মকার। চিড়াভাজা, ছোলা-ভাজা, লুচি প্রভৃতি মদ্যের চাট্‌নিরূপে ব্যবহার্য বস্তুর নাম মুদ্রা। পূজাদিতে বলি-রূপে প্রদত্ত ছাগাদির মাংস বৈধ মাংস। ইহা অভক্ষ্য নহে। বৈধ মাংস, মাছ এবং মুদ্রা সম্বন্ধে কোন কথা উঠে না, কিন্তু মদ্য ও মৈথুন এই দুইটিই সাধনার অঙ্গরূপে কিভাবে গৃহীত হইতে পারে—এই সন্দেহ জাগে। বিশেষতঃ এই উভয় মকারই সভ্য-রুচিকে পীড়া দেয়। তান্ত্রিক সাধকগণ বলিয়া থাকেন—যাঁহারা শাস্ত্রের মর্মার্থ বুঝিতে পারেন না, তাঁহারাই পঞ্চ মকারের নামে নানা দোষারোপ করেন। তন্ত্র-শাস্ত্রে এই পঞ্চ তত্ত্বকে স্থূল, সূক্ষ্ম ও পর, এই তিনপ্রকার দৃষ্টিতে দেখা হয়। মন্ত্রের দ্বারা শোধন না করিয়া সাধক কখনও মকার গ্রহণ করেন না। নির্বিকারচিত্ত সাধকের পক্ষেই পঞ্চ মকারের ব্যবস্থা। পঞ্চম মকারের সাধনের অপর নাম দূতী-যাগ। এই দূতী-যাগের বিধান জ্ঞানার্ণবাদি তন্ত্রে উপদিষ্ট হইয়াছে।

পঞ্চ মকার সেবনেই যদি সিদ্ধি ত্বরান্বিত হয়, তবে অনেক মাতাল ও লম্পটই সিদ্ধ-পুরুষ হইতে পারে, কুলার্ণব-তন্ত্রে এইপ্রকার আশঙ্কার উত্তর দেওয়া হইয়াছে—মদ্যপানেই যদি সিদ্ধি লাভ হয়, তবে মদ্যপহীন মাতালগণও সিদ্ধিলাভ করিতে পারে। মাছ মাংসের ভক্ষণই যদি সিদ্ধির সোপান হয়, তবে সেইরূপ সিদ্ধির পথে কে না আকৃষ্ট হইবে। পঞ্চম মকার যদি সিদ্ধির হেতু হয়, তবে তো জগতের প্রায় সকল জীব-জন্তুই তরিয়া যাইবে। গুরূপদেশ ব্যতীত এইসকল বিষয়ে কোন আলোচনা চলিতে পারে না। অসি-ধারার উপর দিয়া চলা, বাঘের সহিত গলাগলি করা এবং বিষধর সাপ লইয়া খেলা করা অপেক্ষাও

কুল-সাধন কঠিন ব্যাপার। কৌল সাধকগণ এই আচারকেও বেদবাহ্য বলিয়া স্বীকার করেন না। একমাত্র জিতেন্দ্রিয় পুরুষই এইসকল আচারে অধিকারী। অসংযত ব্যক্তির পক্ষে পঞ্চ তত্ত্বের সাধনা বিশেষ দুঃখের এবং পতনের কারণ হইয়া থাকে। ত্রিপুরার্ণব-তন্ত্রে দেখিতে পাই—অজিতেন্দ্রিয় পুরুষ অসংখ্য জন্ম এই আচারে সাধন করিলেও সিদ্ধ হইতে পারে না। কুলার্ণবেও দেখা যায়—যে মদ্যাদি দেবতাদেরও মোহ উৎপাদন করে, সেইসকল বস্তু ভোগ করিয়া যিনি অবিকৃত অবস্থায় মন্ত্র জপ করিতে পারেন, তিনিই কৌলিক। কাম-ক্রোধাদি-বর্জনও কৌলাচারের অঙ্গ।

মকার-পঞ্চকের যোগে কৌল সাধক সদাশিব-তুল্য হইতে পারেন। কুলাচারের সাধনায় দিক্, কাল, উপচার প্রভৃতির কোন নিয়ম নাই। পরশুরাম-কল্পসূত্রে পাওয়া যাইতেছে—

শিষ্টৈঃ সার্ধং চিদগ্নৌ হবিঃশেষং হুত্বা। (৫।২২)

—দেবতার প্রসাদ-রূপে মদ্যাদি গ্রহণের ব্যবস্থা। হবিঃশেষ মদ্যাদি গ্রহণের সময় সাধক ভাবিবেন, সংস্কার ও দেবতার তর্পণের দ্বারা পবিত্রীকৃত হবিঃশেষকে চিদগ্নি আত্মায় আহুতি প্রদান করিতেছি।

ঘৃত প্রভৃতি আহুত বস্তুর দ্বারা অগ্নির জ্যোতিঃ বৃদ্ধি পায়। আহুতি-বুদ্ধিতে গৃহীত হবিঃশেষ মদ্যাদির দ্বারাও চিদগ্নি স্ফুরিত হইয়া থাকে। স্বল্পায়াসে চিত্তকে স্থির করিবার উদ্দেশ্যেই কৌলিকের মকার-সাধনা। যোগিনী-তন্ত্রে উল্লিখিত আছে—

কুলদ্রব্যং সমাশ্রিত্য মনো নিশ্চলতাং নয়েৎ।

—কুলদ্রব্য অর্থাৎ মদ্যাদি বস্তুকে আশ্রয় করিয়া মনকে স্থির করিবে।

কোন কোন তান্ত্রিক বলিয়া থাকেন, একবচনান্ত কুলদ্রব্য-শব্দ প্রাণময়-কোষোৎপন্ন গুরুগম্য একটি বিশেষ বস্তুকে বুঝায়। আর কুলদ্রব্য শব্দে যদি কুলামৃতকে বুঝায়, তবে তাহার অর্থ দাঁড়াইবে—

সহস্রারাৎ স্রবদমৃতং কুলামৃতম্। (সৌভাগ্যভাস্কর)

—সহস্রার হইতে ক্ষরিত অমৃত।

অধিকারি-ভেদে শাস্ত্রীয় বিধি-নিষেধের প্রয়োগ। হিন্দুশাস্ত্রে অধিকার-ভেদে বিনিয়োগ একটি বড় কথা। পঞ্চ তত্ত্বে মুখ্য দ্রব্যের অভাব ঘটিলে শাস্ত্রীয়

প্রতিনিহিত দ্রব্যের দ্বারা পরদেবতার তর্পণ করিতে হয়। মুখ্য দ্রব্য পাওয়া গেলে প্রতিনিধির ব্যবস্থা নাই। কুলার্ণব-তন্ত্র বলিতেছেন—

মৎস্যমাংসবিহীনেন মন্ত্রেনাপি ন তর্পয়েৎ।

ন কুর্যান্মৎস্যমাংসাভ্যাং বিনা দ্রব্যেণ পূজনম্।

—মৎস্য ও মাংস পাওয়া না গেলে কেবল মন্ত্রের দ্বারা তর্পণ করিতে নাই। মন্ত্রের অভাব হইলেও মৎস্য-মাংস দেবতাকে নিবেদন করিতে নাই। এরূপ অবস্থায় প্রতিনিহিত দ্রব্যের দ্বারাই অর্চনা করিতে হয়।

আমাদের মনে হয়, চিত্তকে শুদ্ধ ও স্থির করিয়া সাধনা আরম্ভ করিতে অনেক বিলম্ব ঘটিবার আশঙ্কা। হয়তো সেই কারণেই মরণশীল মানব যাহাতে যে-কোন অবস্থায় থাকিয়াই মহাশক্তির উপাসনা আরম্ভ করিতে পারেন, সেই উদ্দেশ্যে প্রবৃত্তি-মার্গের এইসকল বিধি-ব্যবস্থা। ভোগবাসনা ত্যাগ না করিয়াই সাধক তাঁহার ইষ্টদেবতার শরণ লইবেন—ইহাই তান্ত্রিক সাধনার মর্ম-কথা কি-না, ভাবিবার বিষয়। তন্ত্রের সাধনায় ভোগ ও মোক্ষ পরস্পর বিরুদ্ধ নহে। ঐহিক উন্নতিকেও তান্ত্রিক উপেক্ষা করেন না।

অনেক অসংযত শিশ্নোদর-পরায়ণ পুরুষ মদ্যাদি সেবন করিয়া আপনাকে বীরাচারী বা কৌলিক বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকে। তাহারা শাস্ত্রানুসারে পাতিত্য-দোষে দুষ্ট। প্রবোধচন্দ্রোদয়-নাটকে এইশ্রেণীর কৌলিকম্মন্যকে যথেষ্ট উপহাস ও নিন্দা করা হইয়াছে। সমাজে এইশ্রেণীর লোক সকল সময়েই ছিল, এখনও আছে, ভবিষ্যতেও থাকিবে। ইহাদিগকে দেখিয়াই প্রকৃত কৌলিককে উপহাস করা উচিত হইবে না।

শাস্ত্রে বলা হইয়াছে, কৌল সাধক নিজের আচার ও উপাসনা-পদ্ধতি কোথাও প্রকাশ করিবেন না। তার্কিক বা কোন যুক্তিবাদী পুরুষ যদি যুক্তি-তর্কের অবতারণা করিয়া কৌল-মার্গের দোষ প্রদর্শন করেন, তথাপি কৌলিক সাধক মনে কোন ক্ষোভ রাখিবেন না। তার্কিক বিচারের সাধারণ নিয়ম এই যে, শ্রুতি অপেক্ষা স্মৃতি দুর্বল এবং স্মৃতি অপেক্ষা সম্প্রদায় (গুরুপরম্পরায় প্রাপ্ত উপদেশ) দুর্বল। কিন্তু সাধন-শাস্ত্রে শ্রুতি এবং স্মৃতি অপেক্ষা সম্প্রদায়ই প্রবল হইয়া থাকে। সাধন-শাস্ত্র যুক্তি-তর্কের ঊর্ধ্বে প্রতিষ্ঠিত এবং গুরুগম্য। সেখানে লৌকিক বিচার-প্রণালীর প্রবেশাধিকার নাই। কৌলোপনিষদে—অন্যায়ো ন্যায়ঃ (২৯) এই সূত্রে এইপ্রকার সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে।

মহাভারতে (ভীষ্মপর্ব ৫।১২) উপদিষ্ট হইয়াছে—

অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবাস্তান্ন তর্কেণ সাধয়েৎ।

—বুদ্ধির অগম্য বস্তু বিষয়ে কোন-প্রকার যুক্তি-তর্কের সাহায্যে সিদ্ধান্ত স্থাপন করিতে নাই।

তর্ক করিলে বিশ্বাসের হানি হইতে পারে বলিয়া শাস্ত্র পুনঃপুনঃ উপদেশ করিয়াছেন—

ন গণয়েৎ কমপি। (কৌলোপনিষৎ ৩০)

—গুরুপ্রদত্ত উপদেশ এবং স্বীয় আচারের প্রতিকূলে কোন কথাই শুনিতে নাই। এই শাস্ত্রে বিশ্বাসের স্থানই সর্বোপরি। নিজের সম্বন্ধে সকল কথা গোপন রাখিবার নিমিত্ত বাহিরে অন্য ভাব প্রকাশ করিতে হয়।

কুলার্ণব-তন্ত্র বলিতেছেন, তান্ত্রিক সাধক শৈবাচার ও বৈষ্ণবাচারের অন্তরালে নারিকেলস্থ জলের ন্যায় গোপনে কৌলাচারকে পোষণ করিবেন—

অন্তঃ কৌলো বহিঃ শৈবো জনমধ্যে তু বৈষ্ণবঃ।

কৌলং সুগোপয়েদ্দেবি নারিকেল-ফলাম্বুবৎ॥

মহানির্বাণ-তন্ত্রে পঞ্চ তত্ত্বের যে স্থূল স্বরূপ প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহা হইতে জানা যায়, প্রবৃত্তি-মার্গ হইতে ক্রমশঃ নিবৃত্ত-মার্গে প্রবেশ করিবার উদ্দেশ্যেই সাধক পঞ্চ মকারের সহায়তায় সাধনা করিবেন। স্থূল পঞ্চ তত্ত্বই সর্বসাধারণের বুদ্ধিগম্য হইতে পারে এবং ইহাই শক্তি-সাধনার প্রথম সোপান।

স্মরণ, কীর্তন, কেলি, প্রেক্ষণ, গুহ্যভাষণ, সঙ্কল্প, অধ্যবসায় এবং ক্রিয়ানিষ্পত্তি—এই আটপ্রকার অন্ত্য মকার হইতে সাধকের মনকে নিবৃত্ত করিবার নিমিত্তই গুরু উপদেশ দিয়া থাকেন। মদ্যাদি মকার-চতুষ্টয় সম্বন্ধেও একই কথা। সূক্ষ্ম পঞ্চ মকারের সাধনা সম্বন্ধে আগমসার-তন্ত্র প্রভৃতিতে অনেক তথ্য উপদিষ্ট হইয়াছে।

সহস্রার হইতে যে অমৃতধারা ক্ষরিত হয়, তাহা পান করিয়া যে সাধক আনন্দে বিভোর হইয়া থাকেন, তিনিই প্রকৃত মদ্য দ্বারা সাধনা করেন। জ্ঞান-রূপ খড়্গের দ্বারা যিনি পুণ্য এবং অপুণ্য এই দুইটি পশুকেই হনন করিয়াছেন, তিনিই মাংসাশী। আগমসার-তন্ত্রে মাংস-শব্দের বাক্য-রূপ (মা = রসনা, অংস = প্রিয়) অর্থ গৃহীত হইয়াছে। যিনি বাক্-সংযম করিতে পারিয়াছেন,

তিনিই মাংসাশী। ইড়া ও পিঙ্গলা নাড়ীর মধ্যে যে শ্বাস-প্রশ্বাস বহিয়া অজপা-জপ হইতেছে, এই জপকে যিনি প্রাণায়ামের দ্বারা সংযত করিতে পারেন, তিনিই মৎস্যাশী।

সহস্রদল পদ্মের কর্ণিকা মধ্যে পারদের ন্যায় পবিত্র এবং নির্মল, কোটি কোটি চন্দ্র-সূর্যের জ্যোতিঃ হইতেও জ্যোতির্ময়, অতীব কোমল এবং কুণ্ডলিনী শক্তি-সংযুক্ত যে তেজোরাশি অবস্থিত, তাহারই নাম মুদ্রা। যে সাধক সেই মুদ্রার যথার্থ স্বরূপ জানিতে পারিয়াছেন, তিনিই প্রকৃত মুদ্রাশী।

পরা-শক্তির সহিত আপনার অভেদ বুদ্ধিতে যে সাধক মিলিত হইয়া আনন্দে বিভোর হইয়া থাকেন, তিনিই পঞ্চম তত্ত্বের প্রকৃত স্বরূপ অবগত হইয়াছেন। ইহাই পঞ্চ তত্ত্বের সূক্ষ্ম স্বরূপ। নিবৃত্তি-মার্গের পঞ্চ মকার-রহস্য এইভাবে ব্যাখ্যাত হয়। এতদপেক্ষা উৎকৃষ্ট যে স্বরূপ, তাহাই পর তত্ত্ব। তাহা সম্পূর্ণরূপে গুরুগম্য। শাস্ত্রে কোন উপদেশ দেওয়া হয় নাই।

বাহ্য পূজায় প্রত্যেক অনুষ্ঠানেরই এক একটি বাসনা আছে। অর্থাৎ কোন্ অনুষ্ঠানের বেলা কি প্রকার ভাবনা করিতে হয়, তাহার একটি নিয়ম আছে। পঞ্চ মকারের ভাবনা সম্বন্ধে কুলার্ণব-তন্ত্রে অনেকগুলি বচন আছে—

শ্রীগুরোঃ কুলশাস্ত্রেভ্যঃ সম্যগ্ বিজ্ঞায় বাসনাম্।
পঞ্চমুদ্রা নিষেবেত চান্যথা পতিতো ভবেৎ॥

* * *

ইত্যাদি পঞ্চমুদ্রাণাং বাসনাং কুলনায়িকে।
জ্ঞাত্বা গুরুমুখাদ্দেবি যঃ সেবেত স মুচ্যতে॥

—শ্রীগুরু ও কুল-শাস্ত্র হইতে পঞ্চ তত্ত্বের রহস্য পরিজ্ঞাত হইয়া অনুষ্ঠান করিবে। অন্যথা পাতিত্য-দোষ জন্মে। সুষুম্না-মধ্যগত লিঙ্গ-ত্রয় সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ এবং ষট্‌চক্র-ভেদে সমর্থ উপাসক মূলাধার হইতে ব্রহ্মরন্ধ্র অবধি পুনঃ পুনঃ যাতায়াত করিয়া সহস্রার-স্থিত পীঠস্থানে যাইয়া তত্রত্য মহাপদ্ম-বনে প্রবেশ করিবেন। সেখানে পরম শিব ও কুণ্ডলিনী শক্তির মিলন রূপ সামরস্য হইতে উৎপন্ন আনন্দে পরিপূর্ণ হইয়া সহস্রার পদ্ম-নিঃসৃত সুধা পানে বিভোর হইবেন। উপাসক বাহ্য পূজায় সুরাকে এইভাবে সুধা-রূপে ভাবনা করিয়া সেবন করিবেন।

এইপ্রকার ভাবনা দ্বারা সুরা সুধাতে পরিণত হয়। এইপ্রকার ভাবনার সামর্থ্য না থাকিলে মদ্য-সেবনে পাপ হয়।

যে-উপাসক জ্ঞান-রূপ খড়্গের দ্বারা পাপ-পুণ্যরূপ পশুকে হনন করিয়া পরম শিবে লয় ঘটাইতে পারেন, তিনিই মাংসতত্ত্বে অধিকারী। যিনি মনের সহিত ইন্দ্রিয়সমূহকে সংযত করিয়া পরম শিবে লীন করিতে পারেন, তিনিই মৎস্যাশী। এই প্রকার ভাবনা ব্যতীত উপাসনায় মাংস ও মৎস্য সেবন পাপের হেতু।

শক্তিই মুদ্রা-স্বরূপ। পশু-সাধকের শক্তি অপ্রবুদ্ধ এবং কৌল সাধকের শক্তি প্রবুদ্ধ। যে উপাসক প্রবুদ্ধ শক্তির সেবা করেন, তিনিই প্রকৃত মুদ্রাশী।

পরম শিব ও শক্তির মিলনজনিত আনন্দে বিভোর হইয়া যে উপাসক অবস্থান করেন, তিনিই প্রকৃত অন্ত্য মকারের সেবক।

কুলার্ণবের এই বচনগুলিতে বাহ্য পঞ্চ মকারের বাসনার বিষয় প্রতিপাদিত হইয়াছে। যে-উপাসক অন্তর্যাগে আরূঢ়, বাহ্য পঞ্চ মকারের ব্যবহার তাঁহার ইচ্ছাধীন। সেবন করিলে বা না করিলে তাঁহার কোন দোষ হইবে না। কুলার্ণব-তন্ত্রের পঞ্চমোল্লাসের বচনগুলি নিম্নে উদ্ধৃত হইতেছে—

আমূলাধারমাব্রহ্মরন্ধ্রং গত্বা পুনঃ পুনঃ।
চিচ্চন্দ্রকুণ্ডলীশক্তি-সামরস্যসুখোদয়ঃ॥
ব্যোমপঙ্কজনিঃস্যন্দসুধাপানরতো নরঃ।
সুধাপানমিদং প্রোক্তমিতরে মদ্যপায়িনঃ॥
পুণ্যাপুণ্যপশুং হত্বা জ্ঞানখড়্গেন যোগবিৎ।
পরে লয়ং নয়েচ্চিত্তং পলাশী স নিগদ্যতে॥
মনসা চেন্দ্রিয়গণং সংযম্যাত্মনি যোজয়েৎ।
মৎস্যাশী স ভবেদ্দেবি শেষাঃ স্যুঃ প্রাণিহিংসকাঃ॥
অপ্রবুদ্ধা পশোঃ শক্তিঃ প্রবুদ্ধা কৌলিকস্য চ।
শক্তিং তাং সেবয়েদ্ যস্তু স ভবেৎ শক্তিসেবকঃ॥
পরাশক্ত্যাত্মমিথুনসংযোগানন্দনির্ভরঃ।
য আস্তে মৈথুনং তৎ স্যাদিতরে স্ত্রীনিষেবকাঃ

ইত্যাদি পঞ্চমুদ্রাণাং বাসনাং কুলনায়িকে।
জ্ঞাত্বা গুরুমুখাদ্দেবি যঃ সেবেত স মুচ্যতে॥

তান্ত্রিকগন বলিয়া থাকেন, মন্ত্র অচেতন জড় পদার্থ-মাত্র নহে। সাধনার দ্বারা মন্ত্রের চৈতন্যকে প্রবুদ্ধ করিতে হয়। যে সাধক মন্ত্রের চৈতন্যকে প্রবুদ্ধ করিতে পারেন না, তাঁহার প্রক্রিয়ায় পঞ্চ তত্ত্ব শোধিত হইবে না। অশোধিত পঞ্চ মকার সেবনে পাপ হয়। কুলার্ণব-তন্ত্র বলিতেছেন—

সেবেত মধুমাংসানি তৃষ্ণয়া চেৎ স পাতকী।

সময়াচার-তন্ত্রে দেখা যায়, মন্ত্র দ্বারা যে পঞ্চ তত্ত্ব শোধিত হয় নাই, তাহার ব্যবহার অতিশয় গর্হিত। যোগমার্গ অবলম্বনে সাধক যে-প্রকার আনন্দ অনুভব করেন, কৌল সাধকগণও কুলসাধনায় সেইপ্রকার আনন্দ অনুভব করিতে পারেন। উভয়েরই উপেয় সমান, উপায়-মাত্রে প্রভেদ। যোগমার্গ ভোগবর্জিত এবং কঠোর, আর তন্ত্রমার্গে ভোগের পথেও মুক্তিলাভ। কুলার্ণব-তন্ত্রে বলা হইয়াছে—

যোগী চেন্নৈব ভোগী স্যাদ্ ভোগী চেন্নৈব যোগবিৎ।
ভোগযোগাত্মকং কৌলং তস্মাৎ সর্বাধিকং প্রিয়ে॥

দ্রব্য-শক্তির সাহায্যে সাধনমার্গে অগ্রসর হইতে কঠোরতার প্রয়োজন অল্প। সম্ভবতঃ এইহেতু কৌলিকগণ পঞ্চ তত্ত্বের সাহায্যে সাধনায় সিদ্ধি লাভ করিতে প্রয়াসী হইয়া থাকেন। শাস্ত্রীয় বিধি অনুসারে পঞ্চ তত্ত্বের সেবনে সাধকের কোন পাপের আশঙ্কা করা চলে না। তন্ত্র-শাস্ত্র বলিতেছেন,—

ভোগো যোগায়তে সাক্ষাৎ দুষ্কৃতিঃ সুকৃতায়তে।
মোক্ষায়তে হি সংসারঃ কুলধর্মে মহেশ্বরি॥

—অনাসক্ত সাধকদের ভোগও যোগেরই সমান। আপাতদৃষ্টিতে তাঁহাদের যে আচরণকে দুষ্কৃতি বলিয়া মনে হয়; তাহাও সুকৃতি-স্বরূপ। আর এই সংসারেই তাঁহাদের মুক্তি। কুলধর্মে এইপ্রকার আস্থা রাখিতে হয়। কৌলিক উপাসকগন উপাসনার অঙ্গ-রূপেই মদ্যাদি সেবন করিয়া থাকেন। অন্য সময়ে ব্যবহার করেন না। কুলার্ণব-তন্ত্রে দেখিতে পাই, উপাসনার সময় ব্যতীত অন্য সময় মদ্যাদি গ্রহন করিলে পাপ হয়। যথা—

মৎস্য-মাংস-সুরাদীনাং মাদকানাং নিষেবণম্।
যাগকালং বিনান্যত্র দূষণং কথিতং প্রিয়ে॥

যোগিজন ভোগ বর্জন করিয়া কঠোর তপস্যার দ্বারা যে-প্রকার সিদ্ধি লাভ করেন, কৌলিক উপাসক পঞ্চ তত্ত্বের সাহায্যে কঠোরতা ছাড়াই সেইপ্রকার সিদ্ধি লাভ করিতে সমর্থ হইয়া থাকেন। কুলাচারের সাধনায় শুধু সংযত সাধকেরই অধিকার। চিত্ত-বিকারের যথেষ্ট হেতু সত্ত্বেও নিশ্চল থাকিয়াই সাধককে উপাসনা করিতে হয়।

কুলাচারের ন্যায় সময়াচার নামেও একটি আচারের উল্লেখ পাওয়া যায়। শক্তির উপাসনায় এই দুইটি মত বিহিত হইলেও পরস্পরের ঐক্য নাই। সময়-মত মুখ্যতঃ বেদমার্গকে অনুসরণ করে। বশিষ্ঠ, সনক, শুক, সনন্দন ও সনৎকুমার এই পাঁচজন মুনি সময়াচারের প্রবর্তক। তাঁহাদের অনুমোদিত উপাসনা-পদ্ধতি বশিষ্ঠসংহিতা, সনকসংহিতা, শুকসংহিতা, সনন্দনসংহিতা এবং সনৎকুমার-সংহিতা হইতে জানা যায়। সময়াচারের ফল পাইতে বিলম্ব ঘটে, কৌলাচার শীঘ্র ফলপ্রদ। কৌল উপাসকগণ সাধারণতঃ গোপনেই উপাসনা করিয়া থাকেন।

দেশভেদে বৈশিষ্ট্য

সমগ্র ভারতের হিন্দুসমাজেই এখন তান্ত্রিক সাধনা চলিতেছে—এইকথা একাধিকবার বলা হইয়াছে। দাক্ষিণাত্য ও মহারাষ্ট্রে বৈদিক যাগ-যজ্ঞ এখনও লুপ্ত হয় নাই এবং অনেক অগ্নিহোত্রী ব্রাহ্মণও আছেন, কিন্তু সেইসকল দেশেও তান্ত্রিক উপাসনারই প্রাধান্য। মহারাষ্ট্রে গণপতি ও সূর্যের উপাসকের সংখ্যা কম নহে। দক্ষিণ-ভারতের শাক্তদের মধ্যে অধিকাংশই শ্রীবিদ্যার উপাসক। সেখানে বৈষ্ণবের সংখ্যাধিক্য। শৈবও আছেন, কিন্তু বৈষ্ণবের তুলনায় সংখ্যায় কম। শ্রীমদ্ভাগবতে (১১।৫।৩৮—৪০) বলা হইয়াছে—

কলৌ খলু ভবিষ্যন্তি নারায়ণপরায়ণাঃ।
ক্বচিৎ ক্বচিন্মহারাজ দ্রবিড়েষু চ ভূরিশঃ॥

তাম্রপর্ণী নদী যত্র কৃতমালা পয়স্বিনী।
কাবেরী চ মহাপুণ্যা প্রতীচী চ মহানদী॥ ইত্যাদি।

—তাম্রপর্ণী, কৃতমালা, মহাপুণ্যা কাবেরী ও পশ্চিম ভাগে মহানদী—এই কয়েকটি নদীর জল যাঁহারা পান করেন, তাঁহারা প্রায়ই শ্রীবাসুদেবের ভক্ত হন।

ভাগবতের রচনা কালেও দাক্ষিণাত্যে বৈষ্ণবের সংখ্যা বেশী ছিল ইহা জানা যাইতেছে।

উত্তর-ভারত ও পূর্ব-ভারতে শক্তি-উপাসনার বাহুল্য। উত্তর-ভারতে কিছু কিছু শৈবও আছেন। বঙ্গদেশ ও আসামের হিন্দুসমাজে শাক্তের সংখ্যাই বেশী, বাকী প্রায় সকলই বৈষ্ণব। শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপাতেই বৈষ্ণবের সংখ্যা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিল। পরবর্তী কালে প্রভুপাদ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর প্রভাবেও বৈষ্ণবের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে। বঙ্গীয় শাক্ত সম্প্রদায়ে কালী, তারা প্রমুখ দেবতাদের উপাসকই বেশী, শ্রীবিদ্যার উপাসক খুব কম। এই কারণে একমাত্র শ্রীতত্ত্ব-চিন্তামণি ব্যতীত বঙ্গদেশীয় তন্ত্রনিবন্ধেও মুখ্য কৌলাচারের বিধান বেশী পাওয়া যায় না। দাক্ষিণাত্যের শাক্ত সম্প্রদায়ে শ্রীবিদ্যার পদ্ধতিই বেশী চলে। এই কারণে সেই অঞ্চলের নিবন্ধসমূহে মুখ্য কৌলাচারের উপদেশই বেশী। দাক্ষিণাত্যের কেরল-সম্প্রদায় এবং বাঙ্গালার গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্প্রদায়গত ভেদও কিছু কিছু রহিয়াছে।

উভয় আচারে যদিও পঞ্চ-মকারের বিধান আছে, তথাপি বামাচার আর কৌলাচার এক নহে। বেদাচার-পরায়ণ দ্বিজাতির পক্ষে বামাচারের সাধন চলিতে পারে না, কিন্তু কৌলাচারে তাঁহাদেরও অধিকার আছে। বেদাচার-ভ্রষ্ট দ্বিজাতি বামাচারের দ্বারা কৌলাচারকে গ্রহণ করিতে পারিবেন। বামাচার শূদ্রাদির পক্ষেও বিহিত। দাক্ষিণাত্যে এখনও বৈদিক-মার্গাবলম্বী ব্রাহ্মণাদির সংখ্যা কম নহে। এইহেতু দাক্ষিণাত্যের বেদাচারনিষ্ঠ ব্রাহ্মণগণ বামাচারের পথে না গিয়াও দক্ষিণাচার হইতেই কৌলাচারকে অবলম্বন করিতেন। বঙ্গদেশের শাক্ত সাধকগণ বামাচারের দ্বারা কৌলমার্গ গ্রহণ করিতেন। সম্ভবতঃ এই কারণে দাক্ষিণাত্যের নিবন্ধগুলিতে অবিমিশ্র কৌলাচারের পদ্ধতি দেখিতে পাওয়া যায়। আর বঙ্গদেশের তন্ত্র-নিবন্ধগুলি বামাচার ও কৌলাচারের

পদ্ধতিতে মিশ্রিত। বামাচারের ভিতর দিয়াই বাঙ্গালী তান্ত্রিক সাধকগণ কৌলাচারে প্রবেশ করিতেন বলিয়া তাঁহাদের নিবন্ধে বামাচার ও কৌলাচারের সীমারেখা নির্ণয় করা সুকঠিন। সকল দেশেই সাধকগণ নিজেদের আচার গোপন করিয়া থাকেন। এইহেতু বিশেষ জিজ্ঞাসু ভক্ত ব্যতীত অপর ব্যক্তি তাঁহাদের সন্ধান জানিতে পারে না। মন্ত্রে সিদ্ধি লাভ করার পর সাধক প্রকাশ্যেও অনেক কিছু অনুষ্ঠান করেন। সেই অবস্থায় আচার প্রকাশ করাও দোষের নহে। তিনি তখন নিন্দা-স্তুতির অনেক ঊর্ধ্বে অবস্থিত।

পুরশ্চর্যার্ণবের নবম তরঙ্গে সিদ্ধান্তসংগ্রহ-তন্ত্রের কতকগুলি বচন উদ্ধৃত হইয়াছে। তাহা হইতে জানা যায়, প্রদেশ-ভেদে ভারতে তিনটি তান্ত্রিক সম্প্রদায় ছিল। যথা—গৌড়-সম্প্রদায়, কাশ্মীর-সম্প্রদায় ও কেরল-সম্প্রদায়।

সম্প্রদায়ানথ বচ্মি গৌড়কাশ্মীরকেরলান্। (ইত্যাদি)

গৌড়-সম্প্রদায়ে বামমার্গ সবিশেষ আদৃত। এই সম্প্রদায়ের পূজাদিতে পঞ্চ মকারের মুখ্য দ্রব্যই গৃহীত হইয়া থাকে। এই মতে পূজাতে নৈবেদ্য নিবেদনের পরে হোম এবং তাম্বুল নিবেদনের পরে বলি-দানের বিধান। এই সম্প্রদায় বাম হস্তে পূজা এবং দক্ষিণ হস্তে তর্পণ করেন। ইহারা স্বীয় হৃদয়ে দেবতার বিসর্জন করিয়া থাকেন।

কাশ্মীর-সম্প্রদায়ে পীঠার্চনের পরেই বলিদান এবং পঞ্চোপচার পূজার পরেই হোম করা হয়। এই সম্প্রদায় দক্ষিণ হস্তেই পূজা ও তর্পণ করেন। ইহাতে পঞ্চ মকারের অনুকল্প অর্থাৎ প্রতিনিহিত দ্রব্য গৃহীত হইয়া থাকে। ইহারা স্বকীয় সহস্রারে দেবতাকে বিসর্জন করেন।

কেরল-সম্প্রদায়ে পঞ্চ মকারের ভাবনা-মাত্র; কোন দ্রব্যের অপেক্ষা নাই। পূজার অন্তে বলিদান, দক্ষিণ হস্ত দ্বারা পূজন এবং বাম হস্ত দ্বারা তর্পণ। এই মতে সকল কর্মের সমাপ্তিতে হোম, আর স্ব-হৃদয়ে দেবতার বিসর্জন।

উল্লিখিত বর্ণনা অনুসারে দেখা যাইতেছে, আজকাল বঙ্গদেশেও কেরল-সম্প্রদায়ের রীতিই সমধিক অনুসৃত হইতেছে।

পুরশ্চর্যার্ণবের একাদশ তরঙ্গের কোন কোন বচনেও (প্রকটযোগিনী-মতের) এই তিনটি সম্প্রদায়ের কথা পাওয়া যায়। ইহাতে মনে হয়, এক সময়ে

তান্ত্রিকদের মধ্যে এই তিনটি সম্প্রদায়েরই বহুল প্রচার ছিল। এই তিনটি সম্প্রদায় ব্যতীত 'বিলাস' নামে আরও একটি সম্প্রদায়ের কথা জানা যায়। সেই সম্প্রদায়টি অতি ব্যাপক, সর্বত্র পরিব্যাপ্ত।

বিলাসাখ্যঃ সম্প্রদায়ঃ সর্বগঃ পরিকীর্তিতঃ।[১]

গার্হস্থ্য ও সন্ন্যাস

হিন্দুর সকল শাস্ত্রই গার্হস্থ্য আশ্রমকে সর্বোপরি স্থান দিয়াছেন। তন্ত্রশাস্ত্রও গার্হস্থ্যের প্রশংসায় পঞ্চমুখ। সাধক ইচ্ছা করিলে সন্ন্যাস গ্রহণ করিতে পারেন। মহানির্বাণ-তন্ত্রে (অষ্টমোল্লাস) কলিযুগে বেদোক্ত সন্ন্যাসের নিষেধ করা হইয়াছে। তন্ত্রোক্ত অবধূতাশ্রমই সন্ন্যাস। জাতিবর্ণ-নির্বিশেষে সকলেরই তান্ত্রিক সন্ন্যাস গ্রহণের অধিকার আছে। বৃদ্ধ পিতা মাতা, পতিব্রতা পত্নী এবং শিশু পুত্রকে পরিত্যাগ করিয়া অবধূতাশ্রমে প্রবেশ করা চলিবে না—

মাতরং পিতরং বৃদ্ধং ভার্যাঞ্চৈব পতিব্রতাম্।
শিশুঞ্চ তনয়ং হিত্বা নাবধূতাশ্রমং ব্রজেৎ॥ (মহানির্বাণ-তন্ত্র)

নিষ্কাম কর্ম করিয়া গৃহস্থই ব্রহ্মনিষ্ঠ হইবেন—ইহাও তন্ত্রের উপদেশ। মহানির্বাণ তন্ত্র বলিতেছেন—

ব্রহ্মনিষ্ঠো গৃহস্থঃ স্যাদ্ ব্রহ্মজ্ঞানপরায়ণঃ।
যদ্ যৎ কর্ম প্রকুর্বীত তদ্ ব্রহ্মণি সমর্পয়েৎ॥

তন্ত্রমতে পুরুষের ন্যায় নারীরও অবধূতী হইবার অধিকার আছে।

অবধূতঃ শিবঃ সাক্ষাদবধূতঃ সদাশিবঃ।
অবধূতী শিবা দেবি অবধূতাশ্রমং শৃণু॥ (মুণ্ডমালা-তন্ত্র)।

১. ডাঃ প্রবোধ চন্দ্র বাগচী মহাশয়ের *Studies in the Tantras* গ্রন্থের ৯৯ তম পৃষ্ঠায় সম্মোহ-তন্ত্র হইতে উদ্ধৃত বচন।

এইসকল বিষয়ে মহানির্বাণ-তন্ত্রের অষ্টম উল্লাস এবং মুণ্ডমালা-তন্ত্রের দ্বিতীয় পটলে অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় পাওয়া যায়।

কর্ম, ভক্তি ও জ্ঞান

এই পর্যন্ত তান্ত্রিক সাধনার কর্ম-কাণ্ড বা উপাসনার কথা আলোচনা করা হইয়াছে। সম্প্রতি জ্ঞান-কাণ্ড বা তন্ত্র-শাস্ত্রের দার্শনিক ভাগের কিঞ্চিৎ আলোচনা করা হইবে।

কর্ম-কাণ্ডের প্রকরণে দেখা গিয়াছে, অতি নিম্ন স্তরের উপাসক যেমন তাঁহার উপযোগী উপাসনার পদ্ধতি তন্ত্র-শাস্ত্রে পাইবেন, সেইরূপ অতি উচ্চ স্তরের সাধকও দেখিবেন, তাঁহার উপযোগী উপদেশও কম নহে। হিন্দুশাস্ত্র কখনও কাহাকেও নিরাশ করেন না। সকল-প্রকার অধিকারীকেই কোলে স্থান দেন। অধিকারি-ভেদে শাস্ত্রের বিভিন্ন অনুশাসন প্রযুক্ত হইয়া থাকে। ইতু-পুজা, সুবচনীর ব্রত প্রভৃতি কর্ম হইতে কৌল জ্ঞানীর ব্রহ্ম-তত্ত্ব পর্যন্ত সব কিছুই অধিকারি-ভেদে গ্রাহ্য হইয়া থাকে। হিন্দুর তেত্রিশ কোটি দেবতার তাৎপর্যও এই বুদ্ধিতেই ভাবিতে হইবে।

সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক প্রবৃত্তি-ভেদে এবং এই প্রবৃত্তি-ত্রয়ের সঙ্করজাত অসংখ্য প্রবৃত্তি ভেদে মানুষের প্রকৃতিও সংখ্যাতীত। হিন্দুর বহু-দেবতাবাদ ও একেশ্বরবাদ দেখিয়া বিভ্রান্ত হইবার কারণ নাই। হিন্দু উপাসকদের অধিকার-ভেদের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকিলে যে-কোন জিজ্ঞাসু দেখিতে পাইবেন, অসংখ্য দেবতাকে স্বীকার করিলেও চরম তত্ত্ব অর্থাৎ 'এক-মেবাদ্বিতীয়ম্' শ্রুতির সহিত কোন বিরোধ ঘটে না। শ্রদ্ধার সহিত এই সমন্বয়ের বুদ্ধিতে তন্ত্র-শাস্ত্রের উপাসনা-প্রণালীর বিচার করিলে প্রত্যেক জিজ্ঞাসুই শাস্ত্রের উদারতায় ও দূরদর্শিতায় বিস্মিত হইবেন বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। এই বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনার ক্ষেত্র ইহা নহে।

উপাসনা-প্রণালীর ভিতর শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণব, সৌর ও গাণপত্য সাধকের

ভেদ কল্পিত-মাত্র। পথের বিভিন্নতায় গন্তব্য স্থল ভিন্ন হইয়া যায় না। সকলেরই চরম উপেয় এক, অর্থাৎ অভিন্ন। ব্যবহারিক ভেদের দ্বারা তাত্ত্বিক অভেদ কখনও ক্ষুণ্ণ হয় না। শ্রুতি ও তন্ত্র এবং ভারতীয় অন্যান্য শাস্ত্রেরও এই বিষয়ে একই সিদ্ধান্ত।

কর্ম, ভক্তি ও জ্ঞান—এই তিনের মধ্যেও বাস্তব বিরোধ কিছুই নাই। কর্ম-কাণ্ড জ্ঞান-কাণ্ডের প্রতিকূল বা বিরোধী নহে—এই কথাটিও আমাদিগকে স্মরণ রাখিতে হইবে। প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞান উপস্থিত হইলে জীবন ধারণের অনুকূল কর্ম ব্যতীত উপাসনাদি কর্মের কোন প্রয়োজনই থাকে না। পিতলের পাত্রকেই প্রত্যহ মাজিয়া ঘসিয়া পরিষ্কার রাখিতে হয়, খাঁটি সোনার পাত্রকে মাজিতে হয় না। চরম তত্ত্বের উপলব্ধি হইলে সাধক সর্বত্র পরম শিবের লীলা প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন। সেই অবস্থায় ভেদ-জ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত উপাসনাদি সম্ভবপর নহে।

কর্মই সাধকের হৃদয়ে জ্ঞানের প্রদীপ প্রজ্বলিত করে। ভক্তি ব্যতীত জ্ঞানলভ্য পরম তত্ত্বের প্রতি আকর্ষণই হয় না। তন্ত্র-মতে কর্ম ও জ্ঞানের মধ্য ভূমিতে ভক্তির আসন সুপ্রতিষ্ঠিত। ভক্তির মধ্যস্থতায়ই অনুষ্ঠাতা উপাসক জ্ঞান-ভূমিতে আরোহণ করেন। কর্ম-কাণ্ডের ভিতরে প্রসঙ্গতঃ ভক্তির কথাও আলোচিত হইয়াছে। তন্ত্র-শাস্ত্রেও দার্শনিক আলোচনাই জ্ঞান-কাণ্ডের বিষয়। কর্মের সহিত জ্ঞানের সম্পর্ককে লঘুরূপে বা গৌণরূপে ভাবিলে চলিবে না।

ষট্‌ত্রিংশৎ-তত্ত্ব

আগম-শাস্ত্র ব্রহ্মজ্ঞানের ছয়টি উপায় স্থির করিয়াছেন। ইহাকে বলা হয়, 'ষড়ধ্বা'। যথা—

> ষড়ধ্বষোড়শাধারং ত্রিলিঙ্গং ব্যোমপঞ্চকম্।
> তত্ত্বতো যো বিজানাতি স যাতি পরমাং গতিম্॥

—বর্ণ, পদ, কলা, তত্ত্ব, মন্ত্র, ও ভুবন—ইহাদের যথার্থ জ্ঞান জন্মিলেই ব্রহ্মজ্ঞান হইয়া থাকে। বর্ণ শব্দের অর্থ অক্ষরমালা। কলা হইতেছে—নিবৃত্ত্যাদি পাঁচটি, আর তত্ত্ব-শব্দে ষট্‌ত্রিংশৎ-তত্ত্বকে বুঝাইতেছে। মন্ত্র হইতেছে—সাধকের ইষ্টমন্ত্র। ভুবন—বেদান্ত নির্দিষ্ট ভূরাদি চতুর্দশ ভুবন। যোগমার্গে সাধনার পথে মূলাধার হইতে ব্রহ্মরন্ধ্র অবধি যোড়শাধার দেহস্থিত লিঙ্গত্রয় এবং ব্যোমাদি ক্ষিত্যন্ত পঞ্চ ভূত সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করিতে হয়। যোগমার্গ এবং বৈদিক মার্গ বিশেষ বিশেষ অধিকারীর উদ্দেশ্য সিদ্ধির অনুকূল। পরন্তু আগম-মার্গের দ্বার সকলের নিকটই উন্মুক্ত। উপযুক্ত গুরুর উপদেশে অপেক্ষাকৃত স্বল্পায়াসে স্ত্রী-পুরুষ, উচ্চনীচ-নির্বিশেষে সকলেই তাহাতে বিশেষ বিশেষ স্তরে অধিকার লাভ করিতে পারেন।

ছত্রিশটি তত্ত্বকে অবলম্বন করিয়া তন্ত্র-শাস্ত্রে যে বিচার করা হইয়াছে, তাহাই তন্ত্রের দার্শনিক আলোচনা। সূতসংহিতায় তত্ত্বশব্দের অর্থ বিবৃত হইয়াছে—

> আপ্রলয়ং যত্তিষ্ঠতি সর্বেষাং ভোগদায়ি ভূতানাম্
> তৎ তত্ত্বমিতি প্রোক্তং ন শরীর-ঘটাদি তত্ত্বমতঃ॥

—সৃষ্টির আদি হইতে প্রলয় পর্যন্ত অবস্থিত থাকিয়া যাহা সর্বভূতের ভোগের হেতু হইয়া থাকে, তাহাই তত্ত্ব। এইকারণে শরীর, ঘট প্রভৃতি তত্ত্ব-সংজ্ঞায় অভিহিত হয় না। অর্থাৎ বক্ষ্যমাণ ষট্‌ত্রিংশতত্ত্ব যেরূপ দেশ ও কাল ব্যাপিয়া থাকে, শরীর, ঘট প্রভৃতি সেইরূপ দেশ-কাল ব্যাপিয়া থাকে না।

'তন্' ধাতুর উত্তর কর্তৃবাচ্যে 'ক্বিপ্' প্রত্যয় যোগ করিলে 'তৎ' এই পদ সিদ্ধ হয়। 'তন্' ধাতুর অর্থ বিস্তার বা ব্যাপ্তি। যিনি সকল দেশ ও কাল ব্যাপিয়া থাকেন, তিনিই 'তৎ'। 'তৎ' শব্দ পর-ব্রহ্মের বাচক। শ্রীমদ্ভগবদ্-গীতাতেও (১৭।২৩) পাওয়া যায়—

> ওঁ তৎ সদিতি নির্দেশো ব্রহ্মণস্ত্রিবিধঃ স্মৃতঃ।

—ওঁ, তৎ, সৎ—এই তিনটিই ব্রহ্মবাচক শব্দ।

'তৎ' এর ভাব বা ধর্মকেই 'তত্ত্ব' বলে। শিব হইতে পৃথিবী পর্যন্ত ষট্‌ত্রিংশৎ পদার্থ 'তৎ' এর অসাধারণ ধর্ম বা ভাব। এই কারণে এইগুলিকে

তত্ত্ব বলে। ভোজদেব-কৃত তত্ত্বপ্রকাশের টীকায় শ্রীকুমার তাঁহার গুরু ঈশান-শিবের দুইটি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন। যথা—

ততত্বাৎ সন্ততত্বাচ্চ তত্ত্বানীতি ততো বিদুঃ।
ততত্বং দেশতো ব্যাপ্তিঃ সন্ততত্বঞ্চ কালতঃ॥
লক্ষাদিযোজনব্যাপি তত্ত্বমাপ্রলয়াৎ স্থিতম্।
অন্যথা স্তম্ভকুম্ভাদিরপি তত্ত্বং প্রসজ্যতে॥

'তন্' ধাতুর উত্তর কর্তৃবাচ্যে 'ক্ত' প্রত্যয়ে 'তত' পদটি নিষ্পন্ন হয়, এবং 'সম্' উপসর্গ যোগ করিলে 'সন্তত' পদ সিদ্ধ হয়। যে বস্তু নিরবচ্ছিন্ন-ভাবে বহু দেশ ব্যাপিয়া থাকে, তাহার সংজ্ঞা হইতেছে—'তত', আর নিরবচ্ছিন্ন-ভাবে বহুকাল ব্যাপিয়া থাকিলে তাহাকে বলা হয় 'সন্তত'। ততত্ব ও সন্ততত্ব যাহাতে থাকে তাহাই 'তত্ত্ব'।

ন্যায়াদি-দর্শনের 'পদার্থ' এবং আগমসম্মত এই 'তত্ত্ব' এক হইলেও বিচারে দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য আছে। তান্ত্রিকগণ 'পদার্থ' বুঝাইতে 'তত্ত্ব' শব্দটি প্রয়োগ করায় জানা যাইতেছে—তাঁহারা পরম শিবের ধর্ম-রূপেই সব কিছুকে প্রকাশ করিতে চান। এই সাধন-বিদ্যায় সাধারণ দার্শনিক বিচার তাঁহাদের অভিপ্রেত নহে। পরশুরাম-কল্পসূত্রে দেখিতে পাই—

ষট্‌ত্রিংশত্তত্ত্বানি বিশ্বম্ (১।৪)

—এই বিশ্বে ছত্রিশটি তত্ত্ব বর্তমান। এই ছত্রিশটি তত্ত্বের বাহিরে জগতে কোন বস্তুই নাই। তত্ত্বগুলি হইতেছে— ১. শিব, ২. শক্তি, ৩. সদাশিব, ৪. ঈশ্বর, ৫. বিদ্যা, ৬. মায়া, ৭. অবিদ্যা, ৮. কলা, ৯. রাগ, ১০. কাল, ১১. নিয়তি, ১২. জীব, ১৩. প্রকৃতি, ১৪. মনঃ, ১৫. বুদ্ধি, ১৬. অহঙ্কার, ১৭. শ্রোত্র, ১৮. ত্বক্, ১৯. চক্ষুঃ, ২০. জিহ্বা, ২১. ঘ্রাণ, ২২. বাক্, ২৩. পাণি, ২৪. পাদ, ২৫. পায়ু, ২৬. উপস্থ, ২৭. শব্দ, ২৮. স্পর্শ, ২৯. রূপ, ৩০. রস, ৩১. গন্ধ, ৩২. আকাশ, ৩৩. বায়ু, ৩৪. তেজঃ, ৩৫. জল, ৩৬. পৃথিবী।

১. শিবতত্ত্ব—পরম শিব যখন এক হইতে বহু রূপ ধারণে ইচ্ছা করেন, তখনই সৃষ্টি আরম্ভ হয়। সেই ইচ্ছাশক্তি-রূপ উপাধি-বিশিষ্ট পরম শিবই শিবতত্ত্ব। উপনিষৎ-প্রতিপাদ্য পর ব্রহ্মই পরম শিব। তিনি নির্গুণ হইলেও সৃষ্টিবিষয়িণী

ইচ্ছার উদয় হইলে সগুণ হইয়া থাকেন। তন্ত্র-শাস্ত্রে পরম শিব এবং শিব এই উভয় শব্দই সগুণ ব্রহ্ম এবং নির্গুণ ব্রহ্ম অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে। কোন কোন জায়গায় নির্গুণ ব্রহ্ম অর্থে পরম শিব এবং সগুণ ব্রহ্ম অর্থে শিব-শব্দের প্রয়োগও দেখা যায়। প্রলয়-কালে সূক্ষ্মতাপন্ন জগৎকে স্বাঙ্গীভূত করিয়া শক্তি শিবে বিলীন হইয়া থাকেন। সেই কালে শক্তি নিষ্ক্রিয় থাকেন বলিয়া তদবস্থাপন্ন নির্গুণ ব্রহ্মই পরম শিব। তন্ত্র-মতে সকল বস্তুই চেতন, কিছুই জড় নহে। সকল বস্তুই প্রকাশ-স্বরূপ। বস্তুর প্রকাশ-রূপতাকে বাদ দিলে তাহার কোন অস্তিত্বই থাকে না। অতএব তত্ত্ব-দৃষ্টিতে সকল বস্তুই প্রকাশময় শিব-স্বরূপ। শুধু যে জ্ঞেয় ভাব-পদার্থ ই শিব-স্বরূপ, তাহা নহে, অভাব-পদার্থও তৎ-স্বরূপ। বস্তুর প্রকাশ ও প্রকাশক (প্রমাতা) অভিন্ন। তাঁহাকেও শিব ব্যতীত আর কিছু বলা চলে না।

প্রকাশময় পরম শিব স্বতন্ত্র অর্থাৎ স্বাধীন বলিয়া কোনও প্রমাণ তাঁহার স্বরূপকে পরিমিত অর্থাৎ পরিচ্ছিন্ন করিতে পারে না। প্রমেয় বস্তুগুলিও প্রকাশময়কে পরিচ্ছিন্ন বা বিভক্ত করিতে পারে না। স্বতন্ত্র এবং অন্যানপেক্ষ প্রকাশময় পরম শিব দেশ, কাল প্রভৃতির দ্বারাও সীমাবদ্ধ হইতে পারেন না। যেহেতু তিনি সর্বব্যাপক এবং নিত্য—অর্থাৎ ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান—এই কল্পিত কালত্রয়ের দ্বারা অনির্দেশ্য।

এই পরম শিবকে ছয় ভাবে লক্ষ্য করা যায় বলিয়া আচার্য অভিনবগুপ্ত বলিয়াছেন—(তন্ত্রালোক ১।৬৩) ভোগের আধার ভুবন-রূপে, জগতের সকল বস্তুর দেহ-রূপে, জ্যোতি-রূপে, আকাশাদি-রূপে, নাদ-স্বরূপ শব্দ-রূপে এবং মন্ত্রাত্মক শব্দ-রূপে।

সর্বাত্মক প্রকাশময় পরম শিবকে যে সাধক যে-ভাবে ভাবনা করেন, তিনি সেই ভাবেই তাঁহাকে প্রাপ্ত হন। ইহাও আচার্য অভিনবগুপ্তের সিদ্ধান্ত। যিনি তাঁহাকে ভুবন-রূপে চিন্তা করেন, তিনি ভুবনাধীশত্ব প্রাপ্ত হন। এইভাবে উল্লিখিত ছয়টি ভাবনার ধারা এবং তাহার ফল কীর্তিত হইয়াছে। এই ছয়টি পরস্পর ভেদক উপাধি বা বিশেষণের যোগে ইহাও বোঝা যাইতেছে যে, সঙ্কোচক এই ভুবনাদির প্রলয় ঘটিলেও পরম শিব একই ভাবে বিরাজ করিবেন। কারণ তিনি বিশ্বময় হইলেও বিশ্বোত্তীর্ণ।

আচার্য অভিনবগুপ্ত এই বিষয়ে কামিক-তন্ত্রের প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন—পরম শিব সর্বাকৃতি অর্থাৎ বিশ্বরূপ হইয়াও নিরাকৃতি ও বিশ্বোত্তীর্ণ। একই প্রকাশাত্মা পরম শিব সর্বত্র বিদ্যমান। জল বা আয়নার ভিতরে প্রতিবিম্বিত বস্তু জল বা আয়না হইতে পৃথক্ হইলেও প্রতিবিম্বনের সময় সেই বস্তুকে জলাদি হইতে অভিন্ন বলিয়াই প্রতীতি জন্মে। প্রকাশময় পরম শিবও নিখিল বিশ্বকে অর্থাৎ তাঁহার শক্তিকে এইভাবে আপন হইতে অভিন্ন-রূপে (ক্রোড়ীকৃতভাবে) প্রকাশ করিতেছেন। এই কারণেই তিনি বিশ্বময় হইয়াও বিশ্বোত্তীর্ণ, এবং বিশ্বোত্তীর্ণ হইয়াও বিশ্বময়।

নিখিল বিশ্ব তাঁহারই শক্তি-স্বরূপ এই কথা বিষ্ণুপুরাণেও পাওয়া যাইতেছে—

একদেশস্থিতস্যাগ্নের্জ্যোৎস্না বিস্তারিণী যথা।
পরস্য ব্রহ্মণঃ শক্তিস্তথেদমখিলং জগৎ॥

—একস্থানে অবস্থিত অগ্নির প্রভা যেমন বহু দূর পর্যন্ত বিস্তার লাভ করে, সেইরূপ এই নিখিল বিশ্বই পর ব্রহ্মের শক্তি-স্বরূপ।

পরম শিবকে বিভু, নিত্য, বিশ্বাকৃতি, বিশ্বোত্তীর্ণ প্রভৃতি বিশেষণের দ্বারা বিশেষিত করিলেও তাঁহার স্বরূপের কিছুমাত্র হানি হয় না। আপাতদৃষ্টিতে এই ধর্মগুলি বিভিন্ন হইলেও তাঁহার একমাত্র ধর্ম প্রকাশময়ত্বে এইগুলি অন্তর্ভুক্ত হইতে পারে। তিনি আপনার এবং তাঁহার ধর্মের প্রকাশের নিমিত্ত অপর কাহারও অপেক্ষা করেন না। এই প্রকাশময়ত্বকেই কামিকাদি-তন্ত্রে 'অহং প্রত্যবমর্শ' বা স্বাতন্ত্র্য-শক্তি নামে প্রকাশ করা হইয়াছে। এই স্বাভাবিকী শক্তির যোগেই শিব সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহারে সমর্থ হইয়া থাকেন—

নৈসর্গিকী স্ফুরত্তা বিমর্শরূপাস্য বর্ততে শক্তিঃ।
তদ্‌যোগাদেব শিবো জগদুৎপাদয়তি পাতি সংহরতি॥

(বরিবস্যারহস্য—৪)

আচার্য অভিনবগুপ্তও তন্ত্রালোকে (৩।২৮৩) এই কথাই প্রকাশ করিয়াছেন—

স্বাত্মন্যেব চিদাকাশে বিশ্বমস্ত্যবভাসয়ন্॥
স্রষ্টা বিশ্বাত্মক ইতি * * ॥

—স্রষ্টা আপনাকেই বিশ্ব-রূপে প্রকাশিত করেন। তিনিই বিশ্বাত্মক।

এই স্থলে একটি আশঙ্কা হইতে পারে যে, নানা শাস্ত্র-বচনে পরম শিবের ইচ্ছা, জ্ঞান, ক্রিয়া প্রভৃতি অনন্ত শক্তিমত্তার কথা শোনা যায়, এখানে শুধু স্বাতন্ত্র্য-শক্তির সহিত তাঁহার যোগের কথা বলা হইল। ইহা তো পূর্বাপর-বিরুদ্ধ হইতেছে। এইপ্রকার আশঙ্কা নিরসনের নিমিত্ত বলা হইতেছে—এই স্বাতন্ত্র্য-শক্তিই ইচ্ছা, জ্ঞান, ক্রিয়া প্রভৃতি নানা সংজ্ঞায় কীর্তিত হইয়া থাকে। সুতরাং স্বাতন্ত্র্য-শক্তিমত্তা আর অনন্ত-শক্তিমত্তা একই কথা।

এইভাবে স্বাতন্ত্র্য-শক্তি নামে একটি পৃথক্ বস্তুর সত্তা মানিয়া লইলে আগম-সম্মত অদ্বয়-বাদের হানি ঘটে—এই আশঙ্কাও অকিঞ্চিৎকর। কারণ বস্তুর আপন সত্তা বা রূপই তাহার শক্তি। শক্তি ও শক্তিমানে যথার্থ ভেদ নাই। ভেদ কাল্পনিক মাত্র। এই ভেদ-সিদ্ধান্ত শুধু আরোপিত হয়। সুতরাং পরম শিবকে শক্তিবিশিষ্ট বলিলেও কোন হানি ঘটে না।

সূর্য তেজঃ-পদার্থ, কিন্তু সাধারণতঃ আমরা বলিয়া থাকি, 'সূর্য তেজস্বী', 'সূর্যের তেজ'—ইত্যাদি। সেইরূপ শিব বা ব্রহ্ম স্বয়ং শক্তি-স্বরূপ হইলেও 'শিব শক্তিমান্'—এইপ্রকার প্রয়োগ করা হয়। এই প্রয়োগ শুধু ব্যবহারিক, প্রকৃত নহে। উভয় তত্ত্বই অভিন্ন, অর্থাৎ একই পদার্থ।

আচার্য অভিনবগুপ্ত প্রসঙ্গতঃ আরও একটি আপত্তি উত্থাপন করিয়া খণ্ডন করিয়াছেন। শক্তি ও শক্তিমানের মধ্যে যথার্থ ভেদ না থাকিলেও বিভিন্ন শক্তির মধ্যে পরস্পর ভেদ থাকায় অদ্বয়-বাদের হানি ঘটিতেছে—এইপ্রকার আপত্তির উত্তরে তন্ত্রাচার্যগণ বলিয়াছেন—অগ্নির যেমন দাহিকা শক্তি আছে সেইরূপ পাচিকা শক্তিও আছে। কিন্তু এই দুইটি শক্তিকে পৃথক্‌ভাবে দেখা চলে না। শক্তিবিশিষ্ট অগ্নির শক্তি-রূপে দুইটিকে অভিন্ন-রূপে দেখা হয়। এইভাবে পরম শিবের অনন্ত শক্তি বাস্তবিক বিভিন্ন নহে। শক্তি ও শক্তিমানের ভেদপ্রতীতি যেরূপ অবাস্তব, শক্তিসমূহের পরস্পর ভেদপ্রতীতিও সেইরূপ অবাস্তব। অতএব আগমসম্মত অদ্বয়-বাদের কোন ক্ষতি হইতেছে না।

২. শক্তি—শিবের সৃষ্টিবিষয়িণী ইচ্ছাকেই শক্তি-তত্ত্ব বলা হয়। শিবের ধর্মই শক্তি। এই শক্তি 'বিমর্শ-শক্তি' নামেও অভিহিত হইয়া থাকেন। শ্রুতি হইতেও জানা যায়, সৃষ্টির আরম্ভে পরম ব্রহ্মের সৃষ্টিবিষয়িণী ইচ্ছার স্ফুরণ

হইয়াছিল। এই স্ফুরণের নামই বিমর্শ। ইহাই শক্তির প্রথম প্রকাশ। এক পরম শিবই অনাদি-সিদ্ধ মায়ার যোগে ধর্মী ও ধর্ম—এই উভয়রূপে প্রকাশিত হইতেছেন।

আচার্য ভাস্কর রায় দুর্গা-সপ্তশতীর গুপ্তবতী-টীকার উপোদ্ঘাতে বলিয়াছেন—

পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে,
স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ॥ (শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ ৬।৮)

এই শ্রুতি হইতেই শিবের শক্তির কথা এবং শক্তি ও শক্তিমানের অভেদের কথা কথা জানা যাইতেছে।

অথাতো ধর্মজিজ্ঞাসা—(কৌলোপনিষৎ—১) এই সূত্রে ধর্ম-শব্দ ব্রহ্মের ধর্ম, অর্থাৎ শক্তিকেই বুঝাইতেছে। ভাস্কর রায় আগম-শাস্ত্র হইতে আরও অনেকগুলি শক্তিবাচক শব্দ চয়ন করিয়া গুপ্তবতীতে প্রকাশ করিয়াছেন। যথা—বিমর্শ, চিতি, চৈতন্য, আত্মা, স্বরসোদিতা, পরা বাক্, স্বাতন্ত্র্য, ঐশ্বর্য, সত্তত্ব, সত্তা, স্ফুরত্তা, সার, মাতৃকা, মালিনী, হৃদয়মূর্তি, সংবিৎ, কর্তৃত্ব, স্পন্দ ইত্যাদি।

যদিও নিখিল বিশ্বই পরম শিবের শক্তি, তথাপি জ্ঞান, ইচ্ছা ও ক্রিয়া এই তিন রূপেই শক্তির সমধিক প্রকাশ। মার্কণ্ডেয়-চণ্ডী পাঠ করিতে পাঠকগণ মহাসরস্বতী-রূপে যাঁহাকে স্মরণ করেন, ইনিই জ্ঞানশক্তি। মহাকালী-রূপে যাঁহাকে স্মরণ করেন, ইনিই ইচ্ছাশক্তি এবং মহালক্ষ্মী-রূপে যাঁহাকে স্মরণ করেন, ইনিই ক্রিয়াশক্তি। এই তিনের মধ্যে কোন ভেদ নাই। সকল বিশ্বই শক্তি-স্বরূপ। সুতরাং শক্তি ও শক্তিমানের অভেদই যে তান্ত্রিক-সম্মত পরম তত্ত্ব, ইহাও ভাস্কর রায় বরিবস্যারহস্যে (৮১) প্রকাশ করিয়াছেন—

ব্রহ্মাণি জগতো জগতি চ বিদ্যাঽভেদস্তু সম্প্রদায়ার্থঃ।

শক্তি সকল বস্তুতেই অধিষ্ঠিত। 'আমার ইহা করিবার শক্তি আছে, অথবা শক্তি নাই'—এইপ্রকার উক্তিতে জীবনিষ্ঠ শক্তির অনুভূতি হইয়া থাকে। আচার্য ভাস্কর রায় দেবীভাগবতের একটি শ্লোক সৌভাগ্যভাস্করে উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন, সংসারে নরাধমকে লোকে 'শক্তিহীনই' বলিয়া থাকে, রুদ্রহীন বা বিষ্ণুহীন বলে না। শ্লোকটি এই—

রুদ্রহীনং বিষ্ণুহীনং ন বদন্তি জনাস্তথা।
শক্তিহীনং যথা সর্বে প্রবদন্তি নরাধমম্॥

প্রত্যেক বস্তুতেই আপন আপন প্রয়োজন-সাধিকা শক্তি-রূপে শক্তির এবং বস্তু-রূপে শিবের অধিষ্ঠান স্বীকার করিতে হয়। এই শক্তিকেই আদ্যা শক্তি এবং মহামায়া বলে। শিব শক্তি হইতে অভিন্ন। বেদান্ত-দর্শনের মায়া আর এই শক্তি এক বস্তু নহেন। মায়া জড় পদার্থ, কিন্তু এই মহামায়া নিত্যচৈতন্য-রূপিণী। সংসার-বন্ধনের বেলা এই শক্তিই মায়া-রূপে জীবকে বন্ধন করেন। মোচনের বেলা ইনিই মহামায়া-(শিব) রূপে জীবকে মুক্ত করেন। মার্কণ্ডেয়-চণ্ডীতে এই তত্ত্বটি পরিস্ফুট হইয়াছে—

সৈষা প্রসন্না বরদা নৃণাং ভবতি মুক্তয়ে।

—ইনিই সেই দেবী, যিনি প্রসন্ন এবং বরদা হইলে জীবের মুক্তি দান করেন।

সম্মোহিতং দেবি সমস্তমেতৎ,
ত্বং বৈ প্রসন্না ভুবি মুক্তিহেতুঃ।

—হে দেবি, তুমিই মায়া দ্বারা এই জগৎকে সম্মোহিত করিয়া রাখিয়াছ। তুমি প্রসন্না হইলে সংসারে মুক্ত করিয়া থাক। শিব-শক্তির তত্ত্ব সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবতের দক্ষযজ্ঞ-প্রসঙ্গে ব্রহ্মকৃত শিবস্তবে অনেক কথা বিবৃত হইয়াছে—

জানে ত্বামীশং বিশ্বস্য। ইত্যাদি

শিব ও শক্তিতে আসলে কোন প্রভেদ নাই। লিঙ্গপুরাণ হইতে জানা যায়—

উমাশঙ্করয়োর্ভেদো নাস্ত্যেব পরমার্থতঃ।
দ্বিধাসৌ রূপমাস্থায় স্থিতো একো ন সংশয়ঃ॥

উভয়ের এই মিলিত মূর্তিই অর্ধনারীশ্বরে প্রকাশিত। আচার্য শঙ্করও তাঁহার আনন্দলহরীতে বলিয়াছেন—

ত্বমেব স্বাত্মানাং পরিণময়িতুং বিশ্ববপুষা,
চিদানন্দাকারং শিবযুবতি ভাবেন বিভৃষে।

—শিব ও শক্তি বস্তুতঃ একই তত্ত্ব। শক্তিই শিবের দেহ। উভয়ের মধ্যে অঙ্গাঙ্গি-ভাব সম্বন্ধ। উভয়ই সমরস, পরানন্দ। আনন্দলহরীতে দেখিতে পাই—

শরীরং ত্বং শম্ভোঃ শশিমিহিরবক্ষোরুহযুগম্,
তবাত্মানাং মধ্যে ভগবতি ভবাত্মানমঘম্।
অতঃ শেষঃ শেষীত্যয়মুভয়সাধারণতয়া,
স্থিতঃ সম্বন্ধো বাং সমরসপরানন্দপদয়োঃ॥

—মাতঃ ভগবতি, তুমিই শিবের শরীর। তোমার স্তনযুগল চন্দ্র ও সূর্য-স্বরূপ। তোমার স্বরূপই ভবের (শিবের) স্বরূপ বলিয়া মনে করি। তোমাদের মধ্যে পরস্পর অঙ্গাঙ্গি-ভাব বিদ্যমান রহিয়াছে। (কিন্তু অঙ্গ ও অঙ্গী নির্ণয় করা যায় না।) উভয়ের এই সমরস (মিলন) পরমানন্দ সম্বন্ধই দেখিতেছি।

শিব ও শক্তির মিলনের পরিণামই বিশ্বপ্রপঞ্চ। তান্ত্রিকের দৃষ্টিতে জগতের সকল পদার্থেই চৈতন্যরূপিণী শক্তির লীলা চলিতেছে। অতএব সকল পদার্থই চেতন। অচেতন বলিয়া কিছুই নাই। সাধক এই চিচ্ছক্তিকেই প্রণতি নিবেদন করেন—

চিতিরূপেণ যা কৃৎস্নমেতদ্ ব্যাপ্য স্থিতা জগৎ।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ॥

সাধারণতঃ শক্তিবাচক মহামায়া শব্দে কর্মধারয় সমাস করিলে 'মহতী মায়া' এইপ্রকার ব্যাস-বাক্যে শক্তিকে বুঝায়। আবার বহুব্রীহি সমাসে 'মহতী মায়া যাঁহার' এই ব্যাস-বাক্যে শিবকেও বুঝাইতে পারে। অবশ্য এই অর্থে শব্দটিকে 'মহামায়' বলিতে হয়। অগস্ত্য-কৃত শক্তিসূত্রে শক্তিকে চিৎ, স্বতন্ত্র ও বিশ্ব-সিদ্ধির হেতুরূপে উল্লেখ করা হইয়াছে—

চিতিঃ স্বতন্ত্রা বিশ্বসিদ্ধিহেতুঃ।

শিবসূত্রে শিবকেও চিৎস্বরূপই বলা হইয়াছে—

—চৈতন্যমাত্মা।

শিবকে স্বতন্ত্র বলা হয় নাই। তাহাতেই বুঝিতে হইবে, শক্তিবিরহিত কেবল শিব কর্তৃত্বাদি-ধর্মশূন্য। বামকেশ্বর-তন্ত্রের টীকায় ভাস্কর রায় সিদ্ধান্ত করিয়াছেন—সকলকেই এই মহাশক্তির উপাসনা করিতে হয়। মায়াশক্তিকে আশ্রয় করিয়াই ঈশ্বর মূর্তি পরিগ্রহ করেন। এইহেতু তাঁহার পুংমূর্তি ও স্ত্রীমূর্তি সবই শক্তি-স্বরূপ। শিব ও শক্তির সম্বন্ধ নিত্য। কখনও তাঁহাদের বিচ্ছেদ নাই।

শক্তির পুংশক্তির স্ফুরণে শিব, বিষ্ণু প্রভৃতি দেবতার আবির্ভাব, আর স্ত্রীশক্তির স্ফুরণে দুর্গা, স্বরস্বতী প্রভৃতি স্ত্রী-দেবতার আবির্ভাব। এই তত্ত্ব সবিশেষ অবগত হইয়া উপাসনা করিতে হয়।

শিব ও শক্তি উভয়ের মধ্যে প্রভেদ কল্পিত, বাস্তব নহে—ইহা দেখানো হইয়াছে। কিন্তু এই ভেদ-কল্পনারও সার্থকতা আছে। শিব প্রকাশস্বরূপ মাত্র। তিনি অখণ্ড পূর্ণস্বভাব। তথাপি তিনি বিশেষ বিশেষ শক্তির মধ্যস্থতায় ধ্যানের বিষয়ীভূত হইয়া থাকেন। সেই আংশিক রূপ বা লক্ষণকে অভিনবগুপ্ত 'শৈবীমুখ' বলিয়াছেন। ইহার অপর সংজ্ঞা 'শক্তি'। শক্তি-বিষয়ক জ্ঞানের দ্বারা সাধককে শিব-বিষয়ক জ্ঞান লাভ করিতে হয়। অন্য কোন উপায় নাই। সুতরাং শক্তিই হইতেছেন, শক্তিমান্ শিবের জ্ঞানের উপায়-স্বরূপ। শক্তিমান্ শিব হইতেছেন—উপেয়। এই উপায়োপেয়-ভাবের কথা শিবাগম শ্রীমৎ-কিরণে প্রশ্নোত্তরচ্ছলে স্থির করা হইয়াছে।

যদিও শিবতত্ত্ব বহিরিন্দ্রিয়ের গোচরীভূত হয় না, তথাপি ইহা মানস জ্ঞানের বিষয় হইয়া থাকে। আমাদের ক্ষুধা, তৃষ্ণা প্রভৃতি চক্ষুরাদি বহিরিন্দ্রিয়ের গোচরীভূত না হইলেও মানস অনুভবের বিষয়ীভূত হইয়া থাকে। শিবও এইভাবে মানস জ্ঞানের গোচর হইতে পারেন। কিন্তু প্রথমতঃ শক্তি-বিষয়ক জ্ঞান আবশ্যক। শক্তিজ্ঞানের দ্বারাই শিবজ্ঞান হইয়া থাকে।

কোনও বস্তুকে সর্বাংশে অখণ্ডরূপে জানা হইলেই বস্তুটির জ্ঞান হইল—এই কথা বলা চলে। অংশতঃ জানাকে যথার্থ জানা বলা যায় না। অপূর্ণ জ্ঞানের দ্বারা বস্তুকে সমগ্ররূপে জানা সম্ভবপর নহে। শিবও শক্তির মধ্যস্থতায় জ্ঞাত হইয়া থাকেন বলিয়া তাঁহাকে তো সর্বাংশে জানা সম্ভবপর নহে—এই-প্রকার আশঙ্কার উত্তরে অভিনবগুপ্ত বলিয়াছেন—সর্বাংশে জানা না হইলেই সেই বস্তু অজ্ঞাত রহিল, এমন কোন কথা নাই। বৃক্ষের রস ও গন্ধের প্রত্যক্ষ না হইলেও চাক্ষুষ রূপ প্রত্যক্ষের পর 'বৃক্ষটি প্রত্যক্ষগোচর হইতেছে'—এই কথা কি বলা যায় না? নাদ, বিন্দু প্রভৃতিও শক্তিরই স্বরূপ। যদিও সমস্ত ভুবন-রূপ শক্তির জ্ঞান অসম্ভব, তথাপি নাদ, বিন্দু প্রভৃতি যে-কোন শক্তির মধ্যস্থতায় শিব-বিষয়ক মানস প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে; এই শক্তিই শিব-জ্ঞানের চরম উপায় এবং ভুবনাদি অনন্ত-রূপে এই শক্তিই বিরাজ করিতেছেন। আপাত বুদ্ধিতে

যাহাকে জড়রূপে জানিতেছি, যে বস্তুকে চেতন বলিয়া মনে করিতেছি, সব কিছুই শক্তির স্ফুরণ-মাত্র। জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি প্রভৃতি সকল অবস্থাই শক্তির স্ফুরণ।

জগতে কর্মের ও বস্তুর বৈচিত্র্যের মধ্যেই শক্তির অনন্ত প্রকাশ। পরম শিবের স্বাতন্ত্র্য শক্তির প্রকাশ বলিয়াই সমগ্র জগৎ শক্তি-স্বরূপ। অভিনবগুপ্ত বলিয়াছেন, শিবের বিভূতিই তাঁহার শক্তি। এইভাবে অনন্ত বিভূতি বা বৈচিত্র্যবিশিষ্ট ষড়্ত্রিংশৎ তত্ত্ব-রূপ এই জগতের প্রাণস্বরূপ একমাত্র আনন্দঘন শিবই বিরাজ করিতেছেন। শৈবাগম ত্রিশিরোমতেও শিব-শক্তিতত্ত্ব এই ভাবেই উপদিষ্ট হইয়াছে।

শক্তির স্ফুরণ ও উপাসনা সম্বন্ধে অভিনবগুপ্ত আরও বলিয়াছেন যে, যে-সকল সাধক বোধস্বভাব হইতে পৃথক-রূপে নিয়মিত নাম-রূপবিশিষ্ট ইন্দ্রাদি দেবতাকেই উপাস্য-রূপে ভাবনা করেন, তাঁহারাও স্ব-স্ব উপাস্য দেবতাকে পরম শিব হইতে অভিন্ন বলিয়াই মনে করেন। শিব হইতে অভিন্ন বলায় শক্তি হইতেও অভিন্নই বুঝিতে হইবে।

পরম শিব অনাদি অনন্ত বলিয়া তাঁহার উপাসনা করা যায় না। পরম শিবের শক্তি হইতেই উপাস্য দেবতাগণের প্রকাশ। স্বপ্রকাশা সংবিৎই উপাসকের দেবতারূপে স্ফুরিত হইয়া থাকেন। এই স্ফুরিত শক্তির উপাসনার চরম ফল পরম শিবত্ব-প্রাপ্তি। তন্ত্রালোকের প্রথম আহ্নিকে আগম-বচনকে প্রমাণ-রূপে উদ্ধৃত করিয়া আচার্য অভিনবগুপ্ত এইসকল আলোচনা করিয়াছেন।

নিখিল বিশ্ব বা স্বাতন্ত্র্য-শক্তি পরম শিবে প্রতিবিম্বিত হইয়া থাকে। অর্থাৎ সব কিছুই শিবসত্তায় নিমগ্ন। এই কারণে শিব-শক্তির সম্বন্ধাত্মক শাস্ত্রকে স্পন্দ-বাদ এবং আভাস-বাদ বলা হয়। শিবের স্বাতন্ত্র্যের বলেই বিশ্ব শিবে প্রতিফলিত হইয়া থাকে। অপর কোন পদার্থের সহায়তার প্রয়োজন হয় না। পরম শিবের এই স্বাতন্ত্র্য-শক্তিকে 'পরা প্রতিভা'ও বলা হইয়া থাকে।

এই বৈচিত্র্যময় বিশ্ব যাহাতে উদিত ও অস্তমিত হয়, তাঁহাকে তান্ত্রিক পরিভাষায় 'কুল' বলে। কুলও শক্তিরই স্ফুরণ-বিশেষ। কুল ব্যতিরেকেও যাঁহার সত্তা উপলব্ধ হয়, তিনিই 'অকুল', অর্থাৎ শিব। যে শক্তি অকুল ও কুলের সম্পর্কে অনুকূলতা করে, সেই শক্তিই কৌলিকী পরা শক্তি। প্রভু পরম শিব সেই কৌলিকী পরা শক্তির সহিত নিত্য যুক্ত আছেন। (দ্রষ্টব্য—৫৫ পৃ)

পূর্ণ পরম শিব, শিব শক্তি প্রভৃতি নির্দিষ্ট সংজ্ঞা-রহিত পরম প্রকাশ-স্বরূপ। তিনিই পরম তত্ত্ব। তিনিই স্বাতন্ত্র্য-বশে লীলাচ্ছলে বিশ্বকে প্রকাশিত করিবার নিমিত্ত আপনাতে শিবশক্তি-রূপতা প্রকটিত করেন।

শিব কখনও শক্তিবিরহিত হন না এবং শক্তিও শিববিরহিতা হইতে পারেন না। এই উভয়ের পরস্পর মিলিত রূপের নামই 'যামল'। যামল শব্দের ব্যুৎপত্তিলভ্য অর্থই হইতেছে—'যুগল'। অকুল ও কৌলিকী শক্তির যামল-রূপকে তান্ত্রিক পরিভাষায় 'সংঘট্ট' বলে। সংঘট্ট শব্দের অর্থ সম্যক্ ঘট্টন, অর্থাৎ চলন। স্পন্দ ও চলন একার্থক শব্দ। ইহাকে আনন্দ-শক্তিও বলা হয়। ইহা হইতেই বিশ্বের উদ্ভব। কাশ্মীরীয় আগম-মতকে কেন আভাস-বা দএবং স্পন্দ-বাদ বলা হয়—এই আলোচনা হইতেই তাহা কিছুটা জানা যাইতেছে। আচার্য অভিনবগুপ্তের তন্ত্রালোকে (তৃতীয়াহ্নিক) এইসকল বিষয়ে বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায়।

পরম প্রমাতার সিসৃক্ষা-রূপ যে আকাঙ্ক্ষা উদিত হয়, তাহারই সংজ্ঞা ইচ্ছা-শক্তি। ইচ্ছা-শক্তির ভিতরে অনন্ত শক্তি বিরাজিত। এই ইচ্ছা-শক্তিকেই তান্ত্রিকগণ মহাকালী-রূপে উপাসনা করেন।

ইচ্ছা শক্তি প্রক্ষুব্ধ হইলে তাহা হইতে অনন্ত শক্তির স্ফুরণ হয়। ইচ্ছা-শক্তির ইহাই ঐশ্বর্য বা চরম বিকাশ। প্রস্ফুরিত শক্তিসমূহের মধ্যে পরস্পরের ভেদ স্পষ্টরূপে লক্ষ্য করা যায় না। এই শক্তিগুলি শাস্ত্রবিহিত মুক্তিমার্গের অনুকূল।

ইচ্ছা-শক্তির প্রক্ষোভের পূর্বে যে জ্ঞান আত্মগত থাকে, তাহারই নাম জ্ঞান-শক্তি। জ্ঞাতব্য বা উপভোগ্য বিশ্বের যে উন্মেষ, অর্থাৎ প্রাথমিক পরিস্পন্দ, জ্ঞান-শক্তি প্রথমতঃ তাহাকেই জ্ঞাতব্য বিষয়-রূপে গ্রহণ করিয়া থাকে। যে সকল জ্ঞান শুভ ও অশুভ—এই দ্বিবিধ কর্মের ফলে আসক্তি জন্মাইয়া মুক্তিপথের কণ্টক হইয়া দাঁড়ায়, সেইগুলিকে 'ঘোর'-সংজ্ঞায় অভিহিত করা হইয়াছে। জ্ঞেয় বস্তুর অল্পত্ব ও আধিক্য-বশতঃ জ্ঞান-শক্তিও সঙ্কুচিত ও প্রসারিত হইয়া থাকে। ইষ্যমাণ বস্তু ইচ্ছা-শক্তির প্রভাবে উৎপন্ন হয়, আর জ্ঞান-শক্তিতে এই বস্তুগুলিরই অভিব্যক্তি ঘটে।

যে শক্তিতে জ্ঞায়মান বস্তুগুলি পরিস্ফুরিত হয়, তাহারই সংজ্ঞা ক্রিয়াশক্তি।

শক্তি এক হইলেও জ্ঞেয় ও কার্য-ভেদে শক্তির স্বরূপ অনন্ত। তন্ত্রালোক-গ্রন্থে এইসকল বিষয়ে বহু পরিভাষা দেখিতে পাওয়া যায়।

শক্তি শিব হইতে অভিন্না হইলেও শিবনিষ্ঠা, শিবের ধর্মরূপা এবং শিবের সহিত মিলিত-রূপে যাবতীয় কর্তৃত্বের সম্পাদিকা। এইভাবে ব্যবহারিক প্রয়োজনে শিবের সহিত তাঁহার ঈষৎ ভেদ কল্পিত হইয়াছে।

সগুন-উপাসনা সম্বন্ধে আলোচনা করিলেও জানিতে পারা যায়, নির্গুণ শিব উপাস্যই হইতে পারেন না। উপাস্য দেবতার গুণকীর্তন, নামকীর্তন ইত্যাদি উপাসনার অঙ্গ। উপাসনা-মাত্রই সগুণ-ব্রহ্মবিষয়ক মানস ব্যাপার-বিশেষ। শক্তিরহিত কেবল শিব নির্গুণ বলিয়া তাঁহার ধ্যান, স্তুতি, নামকীর্তন প্রভৃতি সম্ভবপর নহে। অতএব শক্তিবিরহিত শিব উপাস্যই নহেন। যোগিনী-তন্ত্র বলিতেছেন—

শক্ত্যা বিনা শিবে সূক্ষ্মে নাম ধাম ন বিদ্যতে।

—শক্তিবিরহিত সূক্ষ্ম শিবের বাচক শব্দ থাকিতে পারে না এবং শব্দ-ভব তদ্বিষয়ক জ্ঞানও হইতে পারে না। শ্রুতি আছে—(তৈত্তিরীয়োপনিষৎ-—২।৪)

যতো বাচো নিবর্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ।

—যাঁহার রূপ ও গুন আছে, তাঁহার বিষয়েই বাক্য প্রয়োগ করা যাইতে পারে এবং মন দিয়াও তাঁহার বিষয়ে চিন্তা করে চলে। শক্তিবিরহিত শিব রূপ ও গুণের অতীত। কাজেই তাঁহার বিষয়ে বাক্যপ্রয়োগও চলে না, মনও তাঁহার বিষয়ে কোন চিন্তা করিতে পারে না।

শুধু 'নেতি নেতি'—অর্থাৎ তিনি ইহা নন, উহা নন—এইপ্রকার সমস্ত নিষেধের পরিশেষ-রূপে তিনি জ্ঞেয় হইয়া থাকেন। অতএব শুধু শিবজ্ঞান উপাসনাদিতে কোন কাজে লাগে না। বাক্য এবং মনের বিষয়ীভূত না হইলে তাঁহার উপাসনা কিরূপে হইবে? নাম ও গুণের সহিত পর ব্রহ্মের যে রূপ তাঁহারই ইচ্ছায় কল্পিত হইয়াছে, সেই রূপেরও অপর নাম শক্তি। বিষ্ণু, শিব, শক্তি, গণেশ ও সূর্য—প্রধান এই পঞ্চদেবতাও সেই শক্তি-শব্দের বাচ্য। কেবল শিব জ্ঞেয় হইয়া থাকেন। সগুণ উপাসনার দ্বারা বিশুদ্ধীভূত চিত্তে নির্গুণ শিব-বিষয়ক জ্ঞান উৎপন্ন হইতে পারে।

শক্তি-তত্ত্বের পরে যে চৌত্রিশটি তত্ত্বের বিষয় বলা হইবে, বাস্তব দৃষ্টিতে এইগুলিও শক্তি-তত্ত্বেরই অন্তর্গত। আপাতত এইগুলিকে পৃথকরূপে বর্ণনা করার উদ্দেশ্য—শিষ্যের বুদ্ধিবিকাশ। রাজানক জয়রথ-কৃত তন্ত্রালোক-টীকায় (৯।৩১২) একটি তন্ত্রবচন পাওয়া যাইতেছে—

পঞ্চত্রিংশত্তত্ত্বী শিবনাথস্যৈব শক্তিরুক্তেয়ম্।

—শিব ব্যতীত অপর পঁয়ত্রিশটি তত্ত্ব শিবেরই শক্তিস্বরূপ।

ঐ টীকাতে অপর তন্ত্রবচনেও (৫।৪০) এই কথাই পাইতেছি—

শক্তিশ্চ শক্তিমাংশ্চৈব পদার্থদ্বয়মুচ্যতে।

শক্তয়শ্চ জগৎ সর্বং শক্তিমাংশ্চ মহেশ্বরঃ॥

—পদার্থ (তত্ত্ব) মাত্র দুইটি—শক্তি আর শক্তিমান্। নিখিল জগতই শক্তি, আর শক্তিমান্ হইতেছেন—মহেশ্বর।

উপনিষৎ-কীর্তিত ব্রহ্মই যে শক্তি ও শক্তিমানের মিলিত রূপ—এই কথা আচার্য ভাস্কর রায়ও বরিবস্যারহস্যে (৬৯) প্রকাশ করিয়াছেন। শক্তির কার্য বিশ্বের স্ফুরণ, আর শিবের কার্য প্রকাশ। অথচ তাঁহারাই স্ফুরন-প্রকাশ-স্বরূপ।

অহকারৌ শিবশক্তী শূন্যাকারৌ পরস্পরাশ্লিষ্টৌ।

স্ফুরণপ্রকাশরূপাবুপনিষদুক্তং পরং ব্রহ্ম॥

৩. সদাশিব—এই জগৎকে যিনি আপনা হইতে অভিন্ন বলিয়া মনে করেন, তিনিই সদাশিব।

৪. ঈশ্বর—এই জগৎকে যিনি নিজ হইতে ভিন্ন বলিয়া মনে করেন, তিনিই ঈশ্বর। ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও রুদ্র—এই তিন মূর্তি ঈশ্বর-তত্ত্বের অন্তর্ভুক্ত। 'আমি বিশ্ব হইতে ভিন্ন' এই ভাব প্রকাশ পাইলেই সৃষ্টি, পালন ও লয়ের প্রয়োজন হইয়া থাকে। ঈশ্বরই ব্রহ্মাদি-রূপে যথাক্রমে এই তিনটি কর্ম করিয়া থাকেন।

৫. বিদ্যা—অহন্তা ও ইদন্তার অভিন্নত্ব জ্ঞান, অর্থাৎ 'আমিই এই জগৎ'—সদাশিবের এইপ্রকার জ্ঞানের নামই বিদ্যা। এই বিদ্যাকে শুদ্ধ বিদ্যাও বলা হয়। এই বিদ্যাই সদাশিবের মহিষী বা শক্তি। ইহাই ব্রহ্মবিদ্যা।

৬. মায়া—'এই জগৎ আমা হইতে ভিন্ন'—ঈশ্বরের এইপ্রকার জ্ঞানের নামই মায়া। ইহাই ঈশ্বরের শক্তি।

৭. অবিদ্যা—উল্লিখিত বিদ্যার আবরণকারিণী তত্ত্বের নাম অবিদ্যা। ইহার দ্বারা জীবের শিবভাব ও সর্ব্বজ্ঞতা আবৃত হইয়া থাকে।

৮. কলা—শিবের সর্বময় ব্যাপক শক্তি সঙ্কুচিত হইয়া জীবে অবস্থান করে। এই সঙ্কুচিত শক্তিরই নাম কলা।

৯. রাগ—অনুরাগ বা আসক্তিকে রাগ বলা হয়। যে বিষয় মনকে আকর্ষণ করে, সেই বিষয়েই অনুরাগ হইয়াছে, এরূপ বলা চলে। বৈষয়িক তৃপ্তি অপূর্ণ থাকিলে সেই বিষয়েই আসক্তি জন্মে। পরম শিব নিত্য-তৃপ্ত। অতীতে, বর্তমানে বা ভবিষ্যতে তাঁহার কোনরূপ অনুরাগ থাকিতে পারে না। শিবের সেই নিত্য তৃপ্তি সঙ্কুচিত হইয়া অপূর্ণ জীবে আশ্রয় লাভ করে। জীবের তৃপ্তি অসম্পূর্ণ। সর্বদাই ভোগ্য বিষয়ে আসক্তি থাকে। শিবের এই সঙ্কুচিত তৃপ্ততা শক্তিকেই রাগ-তত্ত্ব বলা হয়।

১০. কাল—সকল অনিত্য বস্তুকে কলন অর্থাৎ ধ্বংস করে বলিয়া এই তত্ত্বকে কাল-তত্ত্ব বলা হয়। শিব নিত্য তত্ত্ব, উৎপত্তিরহিত ও বিনাশরহিত। কাল তাঁহাকে ধ্বংস করিতে পারে না। জাগতিক পদার্থের ছয়প্রকার বিকার, অর্থাৎ পরিণাম ঘটে। অহরহঃ প্রত্যেক অনিত্য বস্তুর পরিণাম ঘটিতেছে। ছয়টি পরিণাম হইতেছে—অস্তি (অবস্থান), জায়তে (উৎপত্তি), বর্ধতে (বৃদ্ধি), বিপরিণমতে (অবস্থান্তরপ্রাপ্তি), অপক্ষীয়তে (ক্ষয়) এবং বিনশ্যতি (ধ্বংস)। এই ছয়প্রকার বিকারের পারিভাষিক সংজ্ঞা—ষড়্ভাব-বিকার। শিবের নিত্যতা-শক্তি এই ষড়্ভাববিকার-বশে সঙ্কুচিত হইয়া 'কাল' আখ্যা প্রাপ্ত হয়। চন্দ্র-সূর্যাদির গতি অনুসারে এই কালকে দণ্ড, পল, ঘটিকা, দিন, পক্ষ, মাস, ঋতু, বৎসর, যুগ, কল্প, মন্বন্তর প্রভৃতি-রূপে বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন ভাবে কাল্পনিক বিভাগ করা হইয়াছে।

বস্তু অবস্থান্তরিত না হইয়া স্বরূপে স্থিত হইলেও তাহাকে পরিণামই বলে। এইপ্রকার পরিণামের নাম সদৃশ পরিণাম। শৈব ও শাক্ত দর্শন পরিণামবাদী। জাগতিক প্রত্যেক বস্তুরই পরিণাম ঘটিতেছে। কারণ এই ষড়্ভাব-বিকারের হাত হইতে কোন বস্তুই মুক্ত নহে।

১১. নিয়তি—নিয়তি শব্দের অর্থ নিয়ম। 'এইপ্রকার কাজ করিলে এইপ্রকার ফল হইবে'—এইরূপ নিয়মকেই নিয়তি বলা হয়। শিব নিত্যই

স্বাধীন, সর্বপ্রকারে তিনি স্বতন্ত্র। তাঁহার এই স্বাধীনতা অবিদ্যার যোগে সঙ্কুচিত হইয়া থাকে। সঙ্কুচিত বা পরিমিত স্বাধীনতাই নিয়তি। ইহাকে অদৃষ্ট বা ভাগ্যও বলা হয়।

১২. জীব—জীবই পুরুষ। জীব শিবের অংশ, অর্থাৎ অসর্বজ্ঞ শিব। এইহেতু জীবকে অণু বলে। শিবের এই জীবভাবই শরীর-ধারণ ও মরণের হেতু। এই জীবই অবিদ্যা, কলা, রাগ, কাল এবং নিয়তির আশ্রয়। অগ্নি হইতে যেরূপ অসংখ্য স্ফুলিঙ্গকণা উদ্ভূত হইয়া থাকে, কিন্তু কণাগুলি অগ্নি হইতে অভিন্ন, সেইরূপ শিব হইতে জীবের উৎপত্তি এবং জীব শিব হইতে অভিন্ন।

সৌভাগ্যভাস্করে স্মৃতিসংহিতা ও পুরাণ হইতে এই বিষয়ে বচন উদ্ধৃত হইয়াছে। যথা—

> নিঃসরন্তি যথা লোহপিণ্ডাৎ তপ্তাৎ স্ফুলিঙ্গকাঃ
> সকাশাদাত্মনস্তদ্বদাত্মানঃ প্রভবন্তি হি ॥ (যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতি)
> বিস্ফুলিঙ্গা যথা তাবদগ্নৌ চ বহুধা স্মৃতাঃ।
> জীবাঃ সর্বে তথা শর্বঃ পরমাত্মা চ স স্মৃতঃ ॥ (লিঙ্গপুরাণ)

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাতেও (১৫।৭) জীবকে পরমাত্মার অংশই বলা হইয়াছে—

> মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ।

জীব পরম শিব বা পরব্রহ্মের অংশ-স্বরূপ। ষট্চক্রের রহস্যে জানা যায়, সহস্রারে পরম শিব, হৃদয়ে জীব এবং মূলাধারে কুণ্ডলিনী শক্তি অবস্থিত। জীব পরম শিব হইতে চৈতন্য এবং কুণ্ডলিনী হইতে শক্তি লাভ করেন। পরশুরাম-কল্পসূত্রে (১।৫) বলা হইয়াছে—

> শরীরকঞ্চুকিতঃ শিবো জীবো নিষ্কঞ্চুকঃ পরশিবঃ।

—শরীর অর্থাৎ ত্রিবিধ মলের দ্বারা আবৃত শিবই জীবত্ব প্রাপ্ত হন। এই শরীরাত্মক আবরণ-বিহীন হইলে জীবকেই শিব বলা যায়। পরম শিব সর্বথা স্বতন্ত্র। তাঁহার স্বতন্ত্রত্বে অপর কিছুর অপেক্ষা নাই। শিব স্বেচ্ছায় আপন মায়া-শক্তি দ্বারা পূর্ণ স্বাতন্ত্র্যকে আচ্ছাদন করিলে তাঁহার স্বাতন্ত্র্য পরিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে। এই পরিচ্ছিন্ন বা পরিমিত স্বাতন্ত্র্য-জ্ঞানের নাম 'আণব মল'। আণব মলেরই অপর সংজ্ঞা হইতেছে—'অবিদ্যা'।

পরিচ্ছিন্ন আণব মলের দ্বারা অপরিচ্ছিন্ন চিৎ-স্বরূপ শিবের আবৃত হওয়াও অসম্ভব নহে। অঘটন-ঘটন-পটীয়সী মায়ার সামর্থ্যে সবই সম্ভবপর।

এইভাবে আণব মলের দ্বারা আবৃত হইয়া শিব দেহপরিমিত অণু-রূপ ধারণ করিয়া জীবকে আপনা হইতে ভিন্নরূপে মনে করেন। এই ভেদবুদ্ধিও মায়ারই সামর্থ্যে। এই ভেদবুদ্ধির সংজ্ঞা হইতেছে—'মায়িক মল'।

মায়িক মলের দ্বারা মলিন হইয়া জীব শুভাশুভ কর্মের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। কর্মজনিত সংস্কার জীবেই স্থিতি লাভ করে। এই সংস্কারের বশেই জীবের জন্ম-মরণ, সুখ-দুঃখ প্রভৃতি ভোগ উপস্থিত হয়। এই সংস্কারের পারিভাষিক সংজ্ঞা হইতেছে—'কার্ম মল'।

উল্লিখিত সূত্রে শরীর শব্দের অর্থ আণব, মায়িক ও কার্ম মল। বিভু শিব, অণু অর্থাৎ ক্ষুদ্র জীব-রূপে প্রতিভাত হইলে তাঁহাকেই অণু বলে। তাঁহার এই অণুত্ব-সম্পাদক মলের নামই 'আণব মল'।

১৩. প্রকৃতি—প্রকৃতি শব্দে চিত্তকে বুঝাইয়া থাকে। সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিনটি গুণের সাম্যাবস্থার নাম প্রকৃতি। প্রকৃতিই বুদ্ধি প্রভৃতির মূল কারণ। এই হেতু ইহাকে মূল প্রকৃতিও বলা হয়। সত্ত্বাদি গুণত্রয় এবং বুদ্ধিতত্ত্ব প্রভৃতি পরবর্তী তত্ত্বগুলি প্রকৃতিতে অনভিব্যক্ত হইয়া সূক্ষ্ম-রূপে অবস্থান করে বলিয়া ইহাকে 'অব্যক্ত'ও বলা হয়।

১৪. মনঃ—রজোগুণ-প্রধান যে অন্তঃকরণ, তাঁহাকেই মন বলা হয়। রজোগুণের প্রাধান্য ঘটিলে সত্ত্ব ও তমোগুণ অভিভূত হইয়া থাকে, মন হইতেই সর্ববিধ সঙ্কল্পের উদয় হয়।

১৫. বুদ্ধি—সত্ত্বগুণ-প্রধান যে অন্তঃকরণ, তাহাকেই বুদ্ধি বলে। সত্ত্ব-গুণের প্রাধান্য ঘটিলে রজঃ ও তমোগুণ অভিভূত হইয়া থাকে। বুদ্ধি হইতেই সর্ববিধ নিশ্চয়াত্মক জ্ঞানের উদয় হয়।

১৬. অহঙ্কার—তমোগুণ-প্রধান যে অন্তঃকরণ, তাহারই নাম অহঙ্কার। তমোগুণের প্রাধান্যে সত্ত্ব ও রজোগুণ অভিভূত হইয়া থাকে। অহঙ্কার হইতেই বিকল্প, অর্থাৎ ভেদ-জ্ঞানের উৎপত্তি হইয়া থাকে। 'আমি যাই', 'আমি খাই', 'ইহা আমার' এইরূপে 'আমি' এবং 'আমার' ইত্যাদি জ্ঞান অহঙ্কার-তত্ত্ব হইতে উৎপন্ন হয়।

১৭—২১. শ্রোত্র হইতে ঘ্রাণ পর্যন্ত যে পাঁচটি তত্ত্বের নাম করা

হইয়াছে, এইগুলিকে জ্ঞানেন্দ্রিয় বলে। শব্দগ্রাহক ইন্দ্রিয়ের নাম শ্রোত্র। স্পর্শগ্রাহক ইন্দ্রিয়কে ত্বক্ বলে। রূপগ্রাহক ইন্দ্রিয়ের নাম চক্ষু। রসগ্রাহক ইন্দ্রিয়ই জিহ্বা। গন্ধগ্রাহক ইন্দ্রিয়ের নাম ঘ্রাণ।

২২—২৬. বাক্—উপস্থ—এই পাঁচটি তত্ত্বকে কর্মেন্দ্রিয় বলা হয়। বাক্য উচ্চারণের প্রধান কারণ তত্ত্বের নামই বাক্-তত্ত্ব। গ্রহণ ও ত্যাগের সাধন কর্মেন্দ্রিয়ের নাম পাণি-তত্ত্ব। চলা ফেরার সাধন যে কর্মেন্দ্রিয়, তাহাই পাদ নামে অভিহিত। মল ত্যাগের সাধন যে কর্মেন্দ্রিয়, তাহারই নাম পায়ু। উৎপাদনানন্দের সাধন কর্মেন্দ্রিয়কে উপস্থ বলে।

২৭—৩১. শব্দ—গন্ধ—শব্দ হইতে গন্ধ পর্যন্ত যে পাঁচটি তত্ত্বের উল্লেখ করা হইয়াছে, এইগুলি পঞ্চ তন্মাত্র, সূক্ষ্ম ভূত বা বিষয়। শব্দ-তত্ত্বকে বলা হয় আকাশ-তন্মাত্র, এই তত্ত্ব শ্রবণেন্দ্রিয়ের বিষয়। স্পর্শতত্ত্ব বায়ু-তন্মাত্র, ত্বগিন্দ্রিয়ের বিষয়। রূপতত্ত্ব তেজস্তন্মাত্র, চক্ষুরিন্দ্রিয়ের বিষয়। রস-তত্ত্ব জল-তন্মাত্র, রসনেন্দ্রিয়ের বিষয়। গন্ধ-তত্ত্ব পৃথ্বী-তন্মাত্র, ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের বিষয়হইয়া থাকে।

৩২—৩৬. আকাশ হইতে পৃথিবী পর্যন্ত যে পাঁচটি তত্ত্ব, এইগুলিকে পঞ্চ মহাভূত বলা হয়। আকাশ-তত্ত্ব অবকাশ বা ফাঁক। বায়ু-তত্ত্ব গতি বিশিষ্ট এবং জননী শক্তির উৎস। তেজস্তত্ত্ব দাহিকা শক্তিযুক্ত এবং পাচিকা-শক্তিবিশিষ্ট। জল-তত্ত্ব দ্রবত্ববিশিষ্ট। পৃথ্-তত্ত্ব, কাঠিন্যবিশিষ্ট ও আধার-শক্তির আশ্রয়।

পরশুরাম-কল্পসূত্র ছাড়াও অপর কোন কোন শাস্ত্র-গ্রন্থে তত্ত্বের ষট্‌ত্রিংশৎ সংখ্যার কথা জানিতে পারা যায়। স্কন্দপুরাণে (৺সতীশ চন্দ্র সিদ্ধান্তভূষণ-সম্পাদিত পরশুরাম-কল্পসূত্রে ধৃত, ১২৮ পৃ) পাওয়া যায়—

ষট্‌ত্রিংশত্তত্ত্বপ্রাসাদভূনাথায় নমো নমঃ।

পরমানন্দ-তন্ত্রে উপদিষ্ট হইয়াছে—

ষট্‌ত্রিংশদ্বিধমেতদ্ বৈ তত্ত্বচক্রং সমীরিতম্।

সাংখ্য-দর্শনোক্ত চতুর্বিংশতি তত্ত্বের বাহিরে যে বারটি তত্ত্ব তন্ত্র-শাস্ত্রে স্থান পাইয়াছে, সেইগুলি অতিশয় সূক্ষ্ম বলিয়া হয়তো সাংখ্যদর্শনকার তদ্বিষয়ে কিছুই বলেন নাই। এই না-বলার দরুন দর্শনকারের ন্যূনতা আবিষ্কার করা চলে না। কারণ প্রস্থানভেদে শাস্ত্রের উপদেশ বিভিন্ন রকমের, বিশেষতঃ অধিকারি-ভেদ

একটি বড় কথা। কোন কোন অংশে তন্ত্র-শাস্ত্রের সহিত সাংখ্য-দর্শনের সৌসাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। ষট্‌চক্র, ভূতশুদ্ধি প্রভৃতি যৌগিক ব্যাপার হইলেও এইগুলি তন্ত্রেরই নিজস্ব বস্তু।

কোন কোন তন্ত্র-গ্রন্থে উল্লিখিত ছত্রিশটি তত্ত্বকে তিন ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে—যথা, আত্মতত্ত্ব, বিদ্যাতত্ত্ব ও শিবতত্ত্ব। যে-সকল তত্ত্ব বা পদার্থ শিবের জীবভাবের কারণ এবং যে পদার্থগুলি জীবভাবপ্রাপ্ত শিবের ভোগোপযোগী, সেইগুলিকে আত্মতত্ত্ব বলা হইয়াছে। প্রতিলোম-গ্রন্থে পৃথ্বীতত্ত্ব হইতে মায়াতত্ত্ব পর্যন্ত একত্রিশটি তত্ত্বেই 'সৎ' অংশটি প্রকটিত, কিন্তু 'চিৎ' ও 'আনন্দ' অংশ আবৃত। এইহেতু এই একত্রিশটি তত্ত্বই আত্মতত্ত্ব নামে খ্যাত। শুদ্ধ বিদ্যা, ঈশ্বর ও সদাশিব এই তিনটি তত্ত্বে 'সৎ' ও 'চিৎ' অংশ প্রকটিত কিন্তু 'আনন্দ' অংশ আবৃত। এইহেতু এই তিনটি তত্ত্ব বিদ্যা-তত্ত্বের অন্তর্গত। শক্তি ও শিব এই দুই তত্ত্বে সৎ, চিৎ ও আনন্দ প্রকটিত বলিয়া এই দুইটি তত্ত্ব শিব-তত্ত্বের অন্তর্গত। ছত্রিশটি তত্ত্বের সমষ্টিকে এক কথায় বলা হয় 'তুরীয় তত্ত্ব'। শারদাতিলকাদি প্রামাণিক নিবন্ধে এই তুরীয় তত্ত্বকেই 'সর্বতত্ত্ব' নামে অভিহিত করা হইয়াছে।

ভাস্কর রায়ের সেতুবন্ধ টীকা হইতে জানা যায়, ছত্রিশটি তত্ত্বের মধ্যে প্রতিলোম-ক্রমে পৃথ্বী-তত্ত্ব হইতে শ্রোত্র-তত্ত্ব পর্যন্ত বিশটি তত্ত্ব পৃথ্বী-তত্ত্বেরই অন্তর্গত হইতে পারে। এইরূপে অহঙ্কার-তত্ত্ব হইতে প্রকৃতি-তত্ত্ব পর্যন্ত চারটি তত্ত্ব জলতত্ত্বের অন্তর্গত হইতে পারে। পুরুষ-তত্ত্ব হইতে মায়া-তত্ত্ব পর্যন্ত সাতটি তত্ত্ব তেজস্তত্ত্বের অন্তর্ভুক্ত হইতে পারে। শুদ্ধ বিদ্যা, ঈশ্বর ও সদাশিব এই তিনটি তত্ত্ব বায়ু-তত্ত্বের অন্তর্গত। শক্তি ও শিব এই দুইটি তত্ত্ব আকাশ-তত্ত্বের অন্তর্গত। এই কারণেই বিশ্বকে পাঞ্চভৌতিক বলা হয়।

আত্মতত্ত্ব, বিদ্যাতত্ত্ব এবং শিবতত্ত্ব সম্বন্ধে অন্যপ্রকারের সিদ্ধান্তও দেখিতে পাওয়া যায়।[১] পৃথ্বী-তত্ত্ব হইতে প্রতিলোম-ক্রমে প্রকৃতি-তত্ত্ব পর্যন্ত চব্বিশটি তত্ত্বই আত্ম-তত্ত্বের অন্তর্গত। এই স্থলে আত্ম-তত্ত্বের অর্থ স্থূল শরীর। তান্ত্রিক আচমনে 'আত্মতত্ত্বায় স্বাহা' এই মন্ত্রে স্থূল দেহকে শোধন করা হয়। পুরুষ বা জীব-তত্ত্ব, পরম ব্রহ্ম শিবেরই অংশ বলিয়া তাহাতে প্রকাশকত্ব ধর্ম আছে। আপাত দৃষ্টিতে বোঝা যায়—নিয়তি, কাল, রাগ, কলা, অবিদ্যা ও মায়া—এই

১. পরশুরাম-কল্পসূত্র—পৃ ১৩০ (৺সতীশ চন্দ্র সিদ্ধান্তভূষণ-সম্পাদিত)

ছয়টি তত্ত্বের ধর্ম জড়ত্ব। নিয়তি প্রভৃতি ছয়টি তত্ত্ব জীবকে আশ্রয় করিয়া যখন জীবের সহিত তাদাত্ম্য-ভাবাপন্ন হয়, তখন নিয়তি প্রভৃতির জড়ত্ব এবং পুরুষের প্রকাশকত্ব মিশ্রভাবে উভয়েই আরোপিত হইয়া থাকে। এই কারণে মিশ্রভাবাপন্ন এই সাতটি তত্ত্ব বিদ্যা-তত্ত্বের অন্তর্গত। তান্ত্রিক আচমনে 'বিদ্যাতত্ত্বায় স্বাহা' এই মন্ত্রে সূক্ষ্ম দেহকে শোধন করা হয়। শুদ্ধ বিদ্যা, ঈশ্বর, সদাশিব, শক্তি ও শিব—এই পাঁচটি তত্ত্বের অসাধারণ ধর্ম শুধু প্রকাশকত্ব। এই কারণে এই পাঁচটকেই শিব-তত্ত্বের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। তান্ত্রিক আচমনে 'শিবতত্ত্বায় স্বাহা' এই মন্ত্রে কারণ দেহের শোধন করা হয়। এইপ্রকার তিনটি তত্ত্বের বিভাগ প্রদর্শনান্তে বলা হইয়াছে—

ষট্‌ত্রিংশদ্বিধমেবং বৈ তত্ত্বক্রমং মহেশ্বরি।

তন্ত্র-শাস্ত্রে এই ছত্রিশটি তত্ত্ব সম্বন্ধে নানাপ্রকার সিদ্ধান্ত দেখিতে পাওয়া যায়। অধিকারি-ভেদেই উপদেশের বিভিন্নতা ঘটিয়াছে, ইহা বুঝিতে হইবে। তন্ত্রের কোন বচনকে অপ্রমাণ বলা চলে না। সমস্ত তন্ত্র-শাস্ত্রই হর-পার্বতীর মুখনিঃসৃত।

যুক্তিপ্রধান ন্যায়াদি দর্শন-শাস্ত্রে পদার্থ-সঙ্কলন এবং পদার্থ-বিচারই সমধিক প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। কিন্তু আগম-শাস্ত্রে ষট্‌ত্রিংশৎ-তত্ত্ব বা পদার্থের বিচারের সঙ্গে সঙ্গে অনুষ্ঠান-রূপ কার্যকলাপেরই প্রাধান্য। দার্শনিক বিচার প্রসঙ্গতঃ উপস্থিত হইয়াছে। এই কারণেই এই অংশ দর্শন-সংজ্ঞা প্রাপ্ত হয় নাই।

সংসার

দর্শন-শাস্ত্রের ভিতরে ন্যায়, বৈশেষিক, ভাট্ট মীমাংসা, জৈন-মত প্রভৃতিতে আরম্ভ-বাদ মানা হইয়াছে। এই আরম্ভ-বাদেরই অপর নাম অসৎকার্য-বাদ। সাংখ্য, পাতঞ্জল, ভট্ট ভাস্কর, বল্লভাচার্য, নিম্বার্ক, রামানুজ, মধ্ব, গৌড়ীয়, বৈষ্ণব প্রভৃতি সম্প্রদায় পরিণাম-বাদী। পরিণাম-বাদেরই অপর সংজ্ঞা হইতেছে—সৎকার্য-বাদ। আচার্য শঙ্কর মায়াবাদ বা বিবর্তবাদকে স্বীকার করিয়াছেন। কাশ্মীরের প্রত্যভিজ্ঞা-মতাবলম্বী আচার্যগণ আভাষ-বাদী। স্পন্দ-বাদ এবং আভাস-বাদকে পরিণাম-বাদেরই নামান্তর বলা যাইতে পারে। সদাশিবাদি তত্ত্ব-রূপে পরম শিবের প্রকাশ বা পরিণামকে 'স্পন্দ' বলা হয়। সকল আগমাচার্য দার্শনিকই পরিণাম-বাদ স্বীকার করিয়াছেন। বরিবস্যারহস্য-প্রকাশে স্পষ্টরূপেই বলা হইয়াছে—ইয়ং সৃষ্টিঃ পরব্রহ্মপরিণামঃ।

ভাস্কর রায় সৌভাগ্যভাস্করেও এই সিদ্ধান্তকেই স্থান দিয়াছেন। তন্ত্রের দার্শনিক অংশের আলোচনায় জানিতে পারা যায়, শক্তি ও শক্তিমানে কোন ভেদ নাই। শক্তি, মহেশ্বর, ব্রহ্ম প্রভৃতি শব্দ প্রকৃতপক্ষে একই অর্থের বাচক। পুং-স্ত্রী-ক্লীব-লিঙ্গের ভেদে শব্দের বাচ্যগত ভেদ সাধিত হয় না। তন্ত্র-শাস্ত্র বলিতেছেন—

শক্তির্মহেশ্বরো ব্রহ্ম ত্রয়স্তুল্যার্থবাচকাঃ।

স্ত্রী-নপুংসকো ভেদঃ শব্দতো ন পরার্থতঃ॥ (তন্ত্রতত্ত্বধৃত—৩২৮ পৃ)

শক্তি ও শক্তিমানের অভেদের ন্যায় বস্তুর উপাদান কারণ এবং কার্য বস্তুর মধ্যেও আত্যন্তিক অভেদই তন্ত্রাচার্যগণ স্বীকার করিয়া থাকেন।

শিব-শক্তির লীলা-রূপ ক্রমিক পরিণতিতে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের আবির্ভাব। সৃষ্টিপ্রপঞ্চকে ভাস্কর রায় চারি শ্রেণীতে ভাগ করিয়াছেন। যথা, অর্থময়ী, শব্দময়ী, চক্রময়ী ও দেহময়ী।

তন্তুরূপ কার্যের প্রতি গুটিপোকা নিজেই নিমিত্ত কারণ এবং উপাদান কারণ হইয়া থাকে। অর্থাৎ তাহারই ইচ্ছায় ও চেষ্টায় তাহার তন্তুজাল বিস্তৃত হইতেছে, আবার তাহারই শরীর হইতে তন্তুজালের সৃষ্টি। বিস্তারের বেলা সে নিমিত্ত কারণ এবং সৃষ্টির বেলায় উপাদান কারণ। শিব-শক্তিও সেইরূপ এই জগতের সৃষ্টির নিমিত্ত এবং উপাদান কারণ হইয়া থাকেন। যখনই তিনি বিশ্ব সৃষ্টি করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন, তখনই তিনি নিমিত্ত কারণ, আর যখন সদাশিবাদি তত্ত্ব-রূপে পরিণত হইয়া এই চরাচর সৃষ্টি করিয়াছেন, তখনই তাহাতে উপাদান-কারণতাও বর্তিয়াছে।

শিব ও শক্তি মিলিতরূপে জগতের কারণ। শিব শক্তিযুক্ত হইলেই আপন প্রভুত্ব রক্ষা করিতে সমর্থ হন। শক্তিবিরহিত শিবের প্রভুত্ব তো দূরের কথা, তিনি স্বয়ং নড়িতেই পারেন না। আচার্য শঙ্কর সৌন্দর্যলহরী-স্তোত্রে ইহাই প্রকাশ করিয়াছেন—

শিবঃ শক্ত্যা যুক্তো যদি ভবতি শক্তঃ প্রভবিতুম্,

যো চেদেবং দেবো ন খলু কুশলঃ স্পন্দিতুমপি।

শিব ও শক্তি পরস্পর অভিন্নভাবে পরস্পরের মধ্যে অনুস্যূত। তান্ত্রিক পরিভাষায় ইহাকে 'সমরস' অবস্থা বলা হয়। সমান অর্থাৎ অন্যূন এবং

অনতিরিক্ত রস (আনন্দ) আছে যাঁহাদের, তাঁহারাই 'সমরস'। এই সমরসের ভাবই 'সামরস্য'। শিব-শক্তির পরস্পর অত্যন্ত সংশ্লিষ্ট মিলনের নাম সামরস্য। এই সামরস্য-সম্বন্ধে শক্তি-বিশিষ্ট শিবই পর ব্রহ্ম।

শিব-শক্তির সামরস্য বিষয়ে চিন্তা করিলে বোঝা যায়, প্রত্যেক জীবে শিব-শক্তি-ভাব বিদ্যমান। বিশেষতঃ পুরুষে শিবভাব এবং নারীতে শক্তিভাবের সমধিক প্রকাশ। পঞ্চম মকারের গূঢ় রহস্যও শিব-শক্তির সামরস্যের আস্বাদন।

বস্তুতঃ শিব ও শক্তির পৃথক সত্তা না থাকিলেও পরম শিবই শক্তির অধিষ্ঠান। শিবগত সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহার কার্যে শক্তি হইতেছেন—সঙ্কল্প-নির্বাহিকা। শক্তি সদ্রূপা এবং পরানন্দরূপিণী। সূতসংহিতায় উপদিষ্ট হইয়াছে—

সদাকারা পরানন্দা সংসারোচ্ছেদকারিণী।

সা শিবা পরমা দেবী শিবাভিন্না শিবঙ্করী॥

অগস্ত্যসংহিতায়ও দেখিতেছি, শক্তিবিরহিত শিবের কোন সার্থকতাই নাই—

যয়া দেব্যা বিরহিতঃ শিবোঽপি হি নিরর্থকঃ।

অদ্বৈত বেদান্তে সিদ্ধান্তিত হইয়াছে যে, মায়াই চিৎস্বরূপ পর ব্রহ্মের শক্তি বা ধর্ম। সেই মায়া অবিদ্যারূপিণী এবং জড়স্বভাবা। মায়া হইতে উৎপন্ন জগতের পারমার্থিক সত্তা নাই। তান্ত্রিকগণের সিদ্ধান্ত অন্যরূপ। তাঁহারা বলেন, মহামায়া শিবে অধিষ্ঠিতা। ধর্ম ও ধর্মীর অভিন্নহেতু শক্তি বা মহামায়া জড়স্বভাবা নহেন। ফলতঃ শিব ও শক্তি অভিন্ন হইলেও ব্যবহারিক প্রয়োজনে উভয়ের মধ্যে কিঞ্চিৎ পার্থক্য কল্পনা করা হয়। এই জগৎ শিবশক্তিরই পরিণতি। শক্তিনির্বাহ্য এই বিশ্বপ্রপঞ্চ শিবকুক্ষিতে নিয়ত অবস্থান করিতেছে।

তান্ত্রিকের মতে জগতও আনন্দস্বরূপ, দুঃখের হেতু নহে। জগতকে তিনি বিভীষিকা বলিয়া মনে করেন না। বিশ্বপ্রপঞ্চকে তিনি চৈতন্যের বিলাস-রূপে অনুভব করেন। তান্ত্রিকের দৃষ্টিতে বিশ্ব হেয় বা দুঃখময় নহে।

সৌভাগ্যভাস্করে ভাস্কর রায় বলিয়াছেন, ব্রহ্ম দ্বিবিধ—নির্গুণ ও সগুণ। সগুণ ব্রহ্মের অপর সংজ্ঞা অপর ব্রহ্ম। এই অপর ব্রহ্মকে দুইভাবে জানিতে হইবে। প্রথমতঃ তিনি জগতের নিয়ন্তা, দ্বিতীয়তঃ জগদাত্মক—

জগন্নিয়ন্তা জগদাত্মকশ্চ। (সৌভাগ্যভাস্কর ধৃত স্মৃতি)

তৈত্তিরীয়োপনিষদের (৬।২) শ্রুতি হইতে জানা যায়, তিনি কামনা করিয়াছিলেন—'আমি বহু হইব, আমি জন্ম গ্রহণ করিব'—

সোঽকাময়ত বহু স্যাম্ প্রজায়েয়।

তাঁহার কামনা হইতেই বোঝা যায়, তিনি জগতের নিমিত্ত-কারণ। 'বহু স্যাম্'—এই শ্রুত্যংশ হইতে বোঝা যাইতেছে, তিনিই বিশ্বরূপে পরিণত হইতেছেন, অর্থাৎ তিনিই উপাদান-কারণ। নিমিত্ত-কারণরূপে তিনিই জগতের নিয়ন্তা আর উপাদান-কারণরূপে তিনিই জগদাত্মক, অর্থাৎ বিশ্বরূপ। সৌভাগ্যভাস্কর-ধৃত স্মৃতিবচনে পাওয়া যাইতেছে—

শিবঃ কর্তা শিবো ভোক্তা শিবঃ সর্বমিদং জগৎ।

সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় ইত্যাদির ভেদে জগতের নিয়মও নানাবিধ। সেইহেতু জগন্নিয়ন্তা ব্রহ্মই ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র প্রভৃতির-ভেদে অনেক রূপ গ্রহণ করিয়া থাকেন। ফলতঃ ঈশ্বরাদি সকল তত্ত্বই তাঁহাতে অর্থাৎ শিব-শক্তিতে প্রতিষ্ঠিত।

নিখিল বিশ্বের প্রলয়কালে বিনষ্ট প্রাণিগণের কর্মফল সূক্ষ্মরূপে আপনার মধ্যে সংহত করিয়া একমাত্র অদ্বিতীয় শিবই অবস্থান করেন। শক্তিও তখন অব্যক্তভাবে শিবে বিরাজ করেন। প্রলয়ের নির্দিষ্ট কাল অতীত হইলে প্রাণিগণের কর্মফলের বৈচিত্র্য অনুসারে পুনরায় সৃষ্টির সময়ে অব্যক্তা শক্তি সৃষ্টিবিষয়িণী ইচ্ছা-রূপে প্রকাশিতা হন। অতঃপর এই আবির্ভূতা আদ্যা শক্তি ক্রমশঃ সৃষ্টিরূপে পরিণত হইয়া থাকেন। তন্ত্রশাস্ত্রে সৎকার্য-বাদকে স্বীকার করা হইয়াছে। যে পদার্থের সত্তা নাই, তাহার কখনও উৎপত্তি হইতে পারে না। প্রলয়ের সময় যে জগতের সত্তাই ছিল না, তাহা সৃষ্টিকালে কিরূপে উৎপন্ন হইতে পারে—এইপ্রকার আশঙ্কার উত্তর-রূপে বামকেশ্বর-তন্ত্র বলিতেছেন—

কবলীকৃতনিঃশেষতত্ত্বগ্রামস্বরূপিণী।

—সেই মহাশক্তি প্রলয়কালে তত্ত্বাত্মক সমগ্র জগতকে সম্পূর্ণরূপে নিজের কুক্ষিগত করিয়া অব্যক্ত-রূপে শিবে অধিষ্ঠিতা হন। সূক্ষ্মরূপে কুক্ষিস্থিত জগতকে তিনিই সৃষ্টিকালে প্রকটিত করিয়া থাকেন।

তান্ত্রিকগণের এই সিদ্ধান্তের সহিত শ্রৌত সিদ্ধান্তেরও অনৈক্য ঘটিতে পারে

না বলিয়াই তাঁহাদের বিশ্বাস। তাঁহারা বলিয়া থাকেন, পর ব্রহ্মের পরা শক্তি বিবিধ-রূপে শ্রুত হইয়াছেন—

পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে। (শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ—৬।৮)

এই শ্রুতি হইতে জানা যাইতেছে, বিশ্বপ্রপঞ্চ শক্তিরূপিণী মহামায়ারই পরিণতি। তান্ত্রিকের নিকট এই দৃশ্যমান জগৎ শিব-শক্তির বিচিত্র লীলার রঙ্গমঞ্চ। অভিনেতা রামাদির ভূমিকায় অভিনয় করিলেও তিনি যেমন বাস্তবিকই আপনাকে রাম বলিয়া মনে করেন না, পরন্তু রাম-স্বরূপে তিনি নির্লিপ্তই থাকেন, শিব-শক্তিও সেইরূপ লীলার দ্বারা সংসারে লিপ্ত হইয়া যান না। তাঁহার নিকট তাঁহার লীলা স্বরূপতঃ সত্য না হইলেও সাংসারিক জীবের নিকট অবশ্যই সত্য। সাধনার উচ্চ সোপানে আরোহণ করিলে সাধক এই সংসারকেও লীলা বলিয়া মনে করিতে পারেন। অধিকারি-ভেদে গ্রহণযোগ্য দ্বৈতবাদ ও অদ্বৈতবাদ উভয়ই তন্ত্রশাস্ত্রে স্থান পাইয়াছে। 'আমি উপাসক, তিনি উপাস্য'—এইপ্রকার ভেদবুদ্ধি (শিবের সহিত জীবের) যতকাল লোপ পাইবে না, ততকাল এই সংসারকেও অসত্য বলিবার উপায় নাই। সমস্ত কিছুই শিবশক্তি-স্বরূপ—এইপ্রকার চিন্তা করিবার কথা সাধারণ জীবের কল্পনাতেই আসিতে পারে না। ইহা একপ্রকার যোগ। তারারহস্যে দেখিতে পাই, ভবানী শঙ্করকে বলিতেছেন—

ত্বদ্রূপাঃ পুরুষাঃ সর্বে মদ্রূপাঃ সকলাঃ স্ত্রিয়ঃ।
ইমং যোগং মহাদেব ভাবয়স্ব দিনে দিনে॥

এই ভাবনার দুঃসাধ্যতা যে কতখানি, তাহা জগদীশ্বরকেও এই যোগের ভাবনা করিতে বলায় বোঝা যাইতেছে। এই সংসার শিব-শক্তির লীলা। শিব-শক্তির তত্ত্ব হৃদয়ে পরিস্ফুরিত হইলে সর্বত্রই বিচিত্র লীলা চোখে পড়িবে। প্রত্যক্ষ-সিদ্ধ এই বিশ্বপ্রপঞ্চকে প্রথমেই উপেক্ষা করা চলে না। যদিও সকল শাস্ত্রেই এই কথা উপদিষ্ট, তথাপি তন্ত্রে বিশেষ জোরের সহিত সংসারের এই সত্যতার বিষয় বিঘোষিত হইয়াছে।

শিব ও জীব

ষট্‌ত্রিংশৎ-তত্ত্বের ভিতরে সাধারণভাবে আলোচিত হইলেও প্রথম তত্ত্ব শিবের সহিত দ্বাদশ তত্ত্ব জীবের সম্বন্ধাদিও আলোচনার বিষয়। পরশুরাম-কল্পসূত্রে (১।৫) বলা হইয়াছে—

শরীরকঞ্চুকিতঃ শিবো জীবো নিষ্কঞ্চুকঃ পরমশিবঃ।

শিব এবং জীব যদি বস্তুতঃই দুইটি সম্পূর্ণ পৃথক্ পদার্থ হয়, তবে তান্ত্রিকগণের সম্মত অদ্বৈতবাদ-সিদ্ধান্ত বাধিত হইয়া থাকে। প্রসঙ্গতঃ আমাদের স্মরণ রাখিতে হইবে, বৈদান্তিক অদ্বৈতবাদের সহিত তন্ত্রের সিদ্ধান্তেরও বেশী বিরোধ নাই। উল্লিখিত সূত্রে অদ্বৈতবাদের কথাই বলা হইয়াছে। শিব সম্পূর্ণরূপে স্বতন্ত্র বা স্বাধীন। তাঁহার এই স্বাতন্ত্র্য অন্য কিছুর উপর নির্ভর করে না। শিব স্বয়ং তাঁহার মায়া শক্তির দ্বারা পূর্ণ স্বাতন্ত্র্যকে আচ্ছাদিত করিলে সেই অপ্রকাশ-স্বাতন্ত্র বা অস্বতন্ত্র শিবই জীবত্ব প্রাপ্ত হন। শিব ও জীবের মধ্যে বাস্তব ভেদ নাই। এই ভেদ ঔপাধিক মাত্র। শরীরাত্মক উপাধির দ্বারা উপহিত শিবই জীব, আর শরীরোপাধি-বিরহিত জীবই শিব। জীবকে যে শিবের অংশ বলা হয় (দ্রষ্টব্য—৪৯ পৃ), তাহার তাৎপর্যও এইরূপই বুঝিতে হইবে। বিভু শিবই উপাধির দ্বারা ক্ষুদ্র জীবে পরিণত হইয়া থাকেন। এই কারণে জীবকে 'অণু' বলে। জীবের অণুত্ব-সম্পাদক অবিদ্যার পারিভাষিক সংজ্ঞা 'আনব মল', এই কথা বলা হইয়াছে। পরিমিত আণব মলের দ্বারা অপরিমিত, অর্থাৎ বিভু শিব কি প্রকারে আবৃত হইতে পারেন—এই আপত্তি অকিঞ্চিৎকর। কারণ অনির্বচনীয় মায়ার অঘটনঘটন-পটীয়সী শক্তি অনেক কিছুই করিতে পারে।

শিব যখন জীবরূপ ধারণ করেন, তখন তিনি অসংখ্য জীবকে আপনা হইতে পৃথক্ বলিয়া মনে করেন। এই ভেদজ্ঞানও মায়ারই লীলা। এই ভেদবুদ্ধিই 'মায়িক মল'।

সুভগোদয়ে উক্ত হইয়াছে—

মায়াবিভিন্নবুদ্ধির্নিজাংশভূতেষু নিখিলভূতেষু।
নিত্যং তস্যা নিরঙ্কুশবিভবং বেলেব বারিধিং রুদ্ধে॥

— শিব আপনার অংশভূত বিভিন্ন জীবকেও বিভিন্ন বলিয়াই মনে করেন। তাঁহার এইরূপ অসম্পূর্ণ ভাবনা মায়ারই কার্য। তাঁহার নিত্যত্ব ও নিরঙ্কুশত্ব তখন

বাধাপ্রাপ্ত হয়। বেলাভূমি যেরূপ সমুদ্রকে রুদ্ধ বা সীমাবদ্ধ করিয়া রাখে, এই দুর্ঘটবিধায়িনী মায়াও সেইরূপ শিবের শিবত্বকে সঙ্কুচিত করিয়া জীবে পরিণত করে।

মায়িক মলের দ্বারা আবৃত জীব শুভ ও অশুভ কর্মের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। শুভাশুভ কর্ম হইতে উৎপন্ন সংস্কারও জীবেই প্রতিষ্ঠিত। এই সংস্কারের ফলে জীবের সুখ, দুঃখ, জন্ম, মরণ প্রভৃতি ঘটিতেছে। যে শরীর-রূপ কঞ্চুক অর্থাৎ আচ্ছাদন গ্রহণ করিলে শিব জীবত্ব প্রাপ্ত হন, সেই শরীর শব্দে ত্রিবিধ মলের সমষ্টিকে (দ্রষ্টব্য—৮৩ পৃ) বুঝিতে হইবে। আণব, মায়িক এবং কার্ম—এই ত্রিবিধ মলই সূত্রস্থ শরীর শব্দের অর্থ। অর্থাৎ বর্ণিত ত্রিবিধ মলাত্মক কঞ্চুক বা আচ্ছাদনের দ্বারা আচ্ছাদিত শিবই জীব-রূপে পরিচিত হন। এই জীবকে পুরুষও বলা হয়। পরমার্থসারে উক্ত হইয়াছে—

পরমং যৎ স্বাতন্ত্র্যং দুর্ঘটসম্পাদনং মহেশস্য।
দেবী মায়াশক্তিঃ স্বাত্মাবরণং শিবস্যৈতৎ॥

—মহেশের যে পরম স্বাতন্ত্র্য, দুর্ঘটসম্পাদিকা মায়া-শক্তির দ্বারা তাহা আবৃত হইয়া পড়ে। সুভগোদয় বলিতেছেন—

স তয়া পরিমিতমূর্তিঃ সংকুচিতসমস্তশক্তিরেষ পুমান্।
রবিরিব সন্ধ্যারক্তঃ সংহৃতরশ্মিঃ স্বভাসনেঽপ্যপটুঃ॥

—সন্ধ্যাকালে আরক্ত সূর্য যেরূপ নিজের রশ্মিকে সংহৃত করেন, তখন নিজকে প্রকাশ করিবার শক্তিও তাঁহার থাকে না, সেইরূপ মায়া কর্তৃক শিবের সমস্ত শক্তি সঙ্কুচিত হইলে সেই শিবই পরিমিতমূর্তি জীব-রূপ প্রাপ্ত হন।

জীব তিনপ্রকার—শুদ্ধ, অশুদ্ধ এবং মিশ্র। অজ্ঞানের আশ্রয় হন না বলিয়া শিব, শক্তি এবং সদাশিব শুদ্ধ জীব। অজ্ঞানের আশ্রয় বলিয়া মানুষ হইতে আরম্ভ করিয়া নীচ শ্রেণীর সকল জীবই অশুদ্ধ জীব। বশিষ্ঠাদি মুনি-ঋষিগন সময়-বিশেষে অজ্ঞানবিরহিত এবং সময়বিশেষে অজ্ঞানাবৃত বলিয়া 'মিশ্র' সংজ্ঞায় অভিহিত হইয়া থাকেন।

মুক্তি

সকল সাধনারই চরম লক্ষ্য মুক্তি। মুক্তি সকলের অভিলষিত বলিয়া ইহাকে পরম পুরুষার্থ বলা হয়।

বিচারপূর্বক শাস্ত্র অধ্যয়নের দ্বারা শিব সম্বন্ধে পরোক্ষ জ্ঞান লাভ হইতে পারে, পরন্তু অপরোক্ষ জ্ঞান লাভের নিমিত্ত বিচারপূর্বক শক্তি-তত্ত্ব বিষয়েও জ্ঞান লাভ করা প্রয়োজন। শিবের প্রত্যক্ষ অনুভবরূপ জ্ঞান হইতে মুক্তি লাভ হয়। শিবই পরমাত্মা। যথার্থ দৃষ্টিতে শিব ও জীব অভিন্ন। বিশ্বপ্রপঞ্চের কোন বস্তুর সহিতই শিবের আসলে কোন ভেদ নাই। শিব ও বিশ্বের ভেদজ্ঞান অজ্ঞানপ্রসূত। সাধক সাধনার দ্বারা এই অজ্ঞানকে বিনাশ করিলেই মুক্ত হইয়া থাকেন।

মোক্ষঃ সর্বাত্মতাসিদ্ধিঃ। (কৌলোপনিষৎ—৪)

ইহাই তন্ত্রশাস্ত্রের সিদ্ধান্ত। গুরূপদিষ্ট সাধনমার্গে চলিতে চলিতে সাধক চরম অবস্থায় অদ্বৈত বুদ্ধি লাভ করেন।

সর্বৈক্যতাবুদ্ধিমন্তে। (কৌলোপনিষৎ—২৪)

বহু জন্মের তপস্যার ফলে এইপ্রকার জ্ঞান লাভ করা যায়। শাস্ত্রাধ্যয়ন ও শাস্ত্রবিহিত কর্মের অনুষ্ঠানে চিত্ত বিশুদ্ধ হইয়া থাকে। চিত্ত বিশুদ্ধ হইলে সংসারাসক্তি কিঞ্চিৎ শিথিল হয়। এই অবস্থাতে সাধক ভক্তি-যোগ অবলম্বনের যোগ্যতা লাভ করেন। শ্রীমদ্ভাগবতে ভগবদুদ্ধবসংবাদে (১১।২০।৮) শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—

যদৃচ্ছয়া মৎকথাদৌ জাতশ্রদ্ধস্তু যঃ পুমান্।
ন নির্বিণ্ণো নাতিসক্তো ভক্তিযোগোঽস্য সিদ্ধিদঃ॥

—ভাগ্যবশে ভগবন্নামাদি কীর্তনে যাঁহার শ্রদ্ধা উৎপন্ন হয়, যিনি সংসারে সম্পূর্ণ নিরাসক্ত হন না, অথচ অত্যন্ত আসক্তও থাকেন না, ভক্তি-যোগ তাঁহার পক্ষেই সিদ্ধিপ্রদ।

ভাস্কর রায় সেতুবন্ধের উপোদ্ঘাত-প্রকরণে বলিয়াছেন, ভক্তি দুইপ্রকার—গৌণী ও মুখ্যা। সগুণ শিবের পূজা, জপ, নামকীর্তন প্রভৃতির নাম গৌণী ভক্তি। গৌণী ভক্তি হইতে যে অনুরাগ-বিশেষের উদ্ভব হয়, তাহারই নাম পরা ভক্তি। এইপ্রকার ভক্তিও সগুণ ব্রহ্মকে অবলম্বন করিয়াই জন্মিয়া থাকে। এতাদৃশ সগুণ ব্রহ্ম সাধকের অনুরাগ চরিতার্থ করিতে রাম, কৃষ্ণ প্রভৃতি নানা-রূপ ধারণ করিয়া থাকেন। তাঁহার সেইসকল রূপের ভক্তিসাধন উপাসনা-প্রণালী তন্ত্রাদি-শাস্ত্রে বিবৃত হইয়াছে। শাস্ত্রীয় প্রণালীতে উপাসনা আরম্ভ করিলে

সংসারের প্রতি অত্যন্ত আসক্তি থাকে না, অথচ সম্পূর্ণরূপে অনাসক্তিও হয় না। এই শ্রেণীর সাধকই ভক্তি-সাধন উপাসনার অধিকারী।

এই প্রকার উপাসনার ফলে চিত্ত বিশুদ্ধতর হয় এবং ভগবান্ কৃপা করিয়া থাকেন। মার্কণ্ডেয়-চণ্ডীতে আছে—

সৈষা প্রসন্না বরদা নৃণাং ভবতি মুক্তয়ে।

—সেই দেবী প্রসন্না এবং বরদা হইয়া মানবকে মুক্ত করিয়া থাকেন। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাতেও (৭।১৪) ভগবান্ একই প্রকারের আশ্বাস দিয়াছেন—

মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে।

—আমাকে যাহারা আশ্রয় করে, তাহারাই এই মায়া উত্তীর্ণ হইতে পারে।

অবিদ্যাবদ্ধ জীব আপনার শিবত্ব ভুলিয়া অণুত্ব বা জীবত্ব লাভ করে। সাধনার দ্বারা ভগবৎপ্রসাদে তাহার অবিদ্যার বন্ধন ছিন্ন হইলে পুনরায় 'আমিই শিব' ইত্যাকার জ্ঞান লাভ হয়। সেই সময় বিভুত্ব, সর্বজ্ঞত্ব প্রভৃতি গুণও তাঁহাতে প্রকটিত হয়। এইপ্রকার শিবত্ব-লাভই মুক্তি।

পরশুরাম-কল্পসূত্র হইতে জানা যায়—

স্ববিমর্শঃ পুরুষার্থঃ। (১।৬)

—নিজের স্বরূপ সম্বন্ধে যথার্থ জ্ঞানই পুরুষার্থ বা মুক্তি। জীবে সর্বদা শিবত্ব বর্তমান থাকিলেও অবিদ্যার মোহে জীব তাহা ভুলিয়া যায়। ভগবৎপ্রসাদে সেই আবরণ দূর হইলে জীব নিজের শিব-স্বরূপত্ব জানিতে পারে। এই জানাই জীবের মুক্তি।

আত্মলাভান্ন পরং বিদ্যতে। (পরশুরাম-কল্পসূত্র—১।২৮)

—শিবই জীবের আত্মা বা স্বরূপ। স্বরূপ লাভের অপর নামই মুক্তি। কিন্তু শিবের অর্থাৎ ভগবানের কৃপা ব্যতীত মুক্তি লাভ হইতে পারে না।

মহানির্বাণ-তন্ত্রেও (১৪শ উল্লাস) মুক্তি সম্বন্ধে একই প্রকারের উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে—

জ্ঞানং জ্ঞেয়ং তথা জ্ঞাতা ত্রিতয়ং ভাতি মায়য়া।
বিচার্যমাণে ত্রিতয়ে আত্মৈবৈকোঽবশিষ্যতে॥
জ্ঞানমাত্মৈব চিদ্রূপো জ্ঞেয়মাত্মৈবচিন্ময়ঃ।
বিজ্ঞাতা স্বয়মেবাত্মা যো জানাতি স তত্ত্ববিৎ॥
এতত্তে কথিতং জ্ঞানং সাক্ষান্নির্বাণকারণম্।

—কেবল মায়ার বিকারেই জ্ঞান, জ্ঞেয় ও জ্ঞাতা এই তিনকে পৃথক বলিয়া মনে হয়। কিন্তু এই তিনের বিচার করিলে একমাত্র আত্মা অবশিষ্ট থাকেন। চৈতন্যময় আত্মাই জ্ঞান, আত্মাই জ্ঞেয় এবং আত্মাই স্বয়ং বিজ্ঞাতা। যিনি ইহা জানেন, তিনিই তত্ত্ববিৎ। সাক্ষাৎ নির্বাণ-মুক্তির কারণ এই তত্ত্ব তোমাকে কহিলাম।

মহানির্বাণ-তন্ত্রের এই প্রকরণের আলোচনায় বোঝা যায়, যতদিন জীবের মায়ামোহ তিরোহিত না হইতেছে যতদিন 'তুমি', আমি' ইত্যাদি ভেদবুদ্ধি রহিতেছে, ততদিন দ্বৈত জগতের ভানও অপরিহার্য। জীব এই অবস্থায় কখনও আপন শিবত্ব স্মরন করিতে পারেন না। মিথ্যাই হউক, স্বপ্নই হউক, আর কল্পনাই হউক—এই দ্বৈতকে বিশ্বাস না করিয়া জীবের সাংসারিক কাজকর্ম চলিতে পারে না। অনিচ্ছা সত্ত্বও কর্মফল এবং সংস্কারের টানে বাধ্য হইয়া জীবকে এই বিশ্বাস করিতেই হইবে।

জন্ম-জন্মান্তরের তীব্র তপস্যাজনিত পুণ্যবলে ভগবৎপ্রসাদে জীব মায়ার বন্ধন ছেদন করিয়া শিবত্ব প্রাপ্ত হন। আরাধনা অর্থাৎ আত্ম-সমর্পণ ব্যতীত তাঁহার অনুগ্রহ লাভ করা যায় না। অতএব তাঁহার আরাধনাই পরম্পরা-সম্বন্ধে মুক্তির প্রযোজক।

নির্বাণ-মুক্তিই জীবের চরম লক্ষ্য। নির্গুণ ব্রহ্মত্ব বা পরম শিবত্ব লাভই নির্বাণ 'শব্দের আগম-সম্মত অর্থ। উপাস্য সগুন ব্রহ্ম বা শিব-রূপতা লাভ করিলেও নির্বান হয় না। এই উদ্দেশ্যেই পরশুরাম-কল্পসূত্রে **'স্ববিমর্শঃ পুরুষার্থঃ'** এইরূপ বলা হইয়াছে। স্ব-শব্দ পরম শিবের বোধক।

মুক্তি সম্বন্ধে অভিনবগুপ্ত (তন্ত্রালোক—১। ৮৪-৮৮) যাহা বলিয়াছেন, তাহাতে বোঝা যায়—পরম শিবকে জানিলেই জীব মুক্ত হইয়া যান, আর তাঁহাকে শরীর পরিগ্রহ করিতে হয় না। জগতের যাবতীয় ভাব-বস্তু ও অভাব-বস্তুকে বাদ দিয়া শুধু পরম প্রকাশ-স্বরূপ শিবে জ্ঞানকে নিশ্চল করিলে তাঁহাকে জানা যায়। অর্থাৎ সকল পদার্থকেই শিবময় ভাবনা করিতে পারিলে আত্মজ্ঞান জন্মে। এইপ্রকার জ্ঞান লাভ করিবার নিমিত্ত সাধনার প্রয়োজন। সাধনার বলে তাঁহারই করুণায় জীব তাঁহাকে জানিতে পারেন।

———